নজরুল সংখ্যা ১৩৮৮

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নজরুল ইসলাম



২৯ মে ১৯৮১

# পশ্চিমবঙ্গ






পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

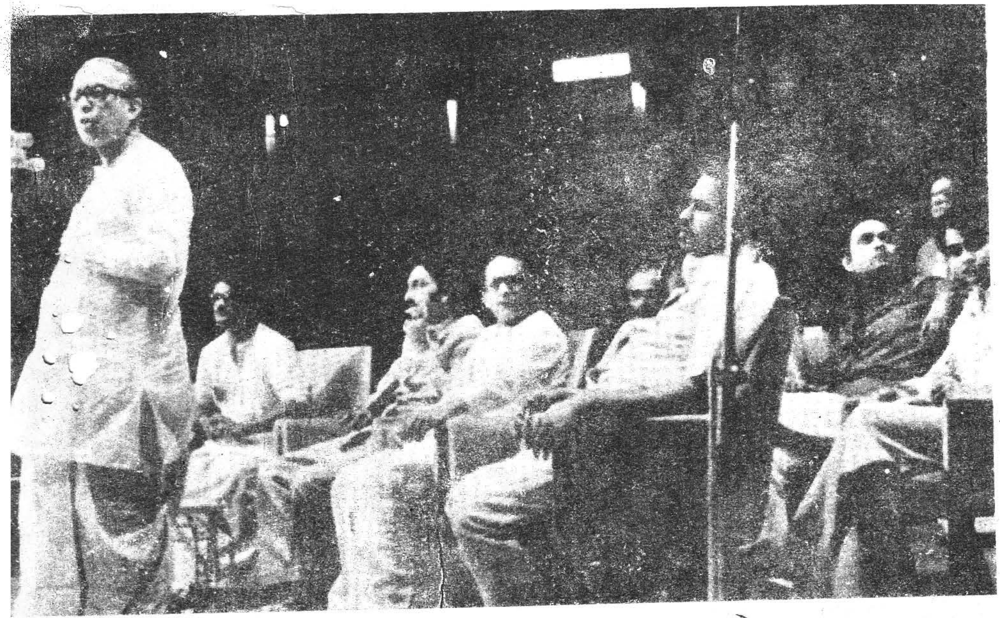
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

# একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



পূর্বভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। পাশে বিহারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশ্যামেল নবী, ত্রিপুরার তথ্যমন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার ও ওড়িশার তথ্যমন্ত্রী শ্রীযুগলকিশোর পট্টনায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।


রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

২৯ মে ১৯৮১ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮


## গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।

ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

### পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।


প্রধান সম্পাদক

সুনীলকুমার সেনগুপ্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২০ পয়সা

মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা

তথ্য অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

২৩, আর এন মুখার্জি রোড

কলিকাতা-৭০০০০১


## বিষয়সূচি

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৪৮ ২৯ মে ১৯৮১ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮

পূর্ব ভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

# অখণ্ড ভারতের মানসিকতা নিয়েই জাতীয় সংহতি ও ঐক্যকে সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে হবে

## মুখ্যমন্ত্রী

আমরা যদি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাই যে আমরা ভারতবাসী, তাহলে দীর্ঘদিনের সমস্ত রকম ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা কেউ বাংলা, কেউ হিন্দি, কেউ ওড়িয়া, কেউ অসমীয়া ভাষায় কথা বলতে পারি, কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা ভারতবাসী। ভারত আমাদের দেশ। জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, ও আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা ভারতবাসী। এই মনোভাব নিয়েই আমাদের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে হবে।

২৩ মে ১৯৮১ কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী পূর্ব ভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা বলেন।

### বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর বলিষ্ঠ আঘাত

এগারোটি আলো জ্বালিয়ে এক উদ্দীপনাময় পরিবেশে সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ্রীবসু বলেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই সম্মেলন উদ্বোধন করছি। আজকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ধরনের অনুষ্ঠান অন্য অন্য প্রদেশে এবং আরও বেশি বেশি করা দরকার। এর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে জানার সুযোগ পান। ভাব-ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান ঘটে। ভাষা ও ধর্মের গোঁড়ামির অবসান হয়, জাতীয় সংহতি দৃঢ় হয় এবং আঞ্চলিকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের ওপর বলিষ্ঠ আঘাত হানার সুযোগ ঘটে।

অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, দেশ স্বাধীন হবার অনেক দিন পরেও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিভেদের মধ্যে ঐক্যের কথা বলি, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে সেই ঐক্যকেই ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা চলছে। আমাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে কারও কোনো মতান্তর বা মতবিরোধ থাকতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলে দেশের মানুষের কোনো কল্যাণ হতে পারে না। দেশের সাবিক উন্নতি বিচ্ছিন্ন মানসিকতার পরিবেশে গড়ে উঠতে পারে না। সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশের ছেলে-মেয়েদের মনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেতনাকে আমরা জাগ্রত করে তুলতে পারি। যেকোনো মূল্যে দেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতিগুলিকে রক্ষা

( শেষাংশ পরের পৃষ্ঠায় )

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্মেলক সংগীত



# পশ্চিমবঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সরকার চালাতে সকলের সহযোগিতা চাই মুখ্যমন্ত্রী

১২ মে '৮১, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঘাটাল বিদ্যাসাগর মাঠে এক বিশাল জনসমাবেশে বিগত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি উল্লেখ করে বলেন, চার বছর আগে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিশ্রুতি মত দু'বছরের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যদের সববিষয়ে সহযোগিতা করতে সরকার সর্বস্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁরা গঠনমূলক কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। এই সরকার কলকাতায় বসে কাগজে রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে সরকার চালায় না। গ্রামের মানুষের বাস্তব রিপোর্টকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা কাজ পরিচালনা করেন, কারণ এই সরকার গ্রামের মানুষকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে।

পৌরসভার ভোটাধিকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এই সরকারই প্রথম আঠার বছরের ছেলেমেয়েদের ভোটের অধিকার দিয়েছে। সারা ভারতবর্ষে এর কোন নজীর নেই। সরকার এই বয়সের ছেলেমেয়েদের চেতনা বাড়াতে, সৎপথে রাখতে, শিক্ষিত করতে ও প্রথম থেকেই সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে চান।

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রথম বছরে দেড় কোটি টাকা, দ্বিতীয় বছরে ২ কোটি ও তৃতীয় বছরে ৭ কোটি টাকা দিয়েছে। যা আগে কখনও হয়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে, টাউন হল, প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরী, কমিউনিটি হল নির্মাণ করতে এই সরকার বিভিন্ন পৌরসংস্থাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন, সারা ভারতের ২০০০ পৌরসভার মধ্যে প্রায় ১৭০০ পৌরসভায় বার তের বছরে কোন নির্বাচন হয়নি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নানারকম হিংসাত্মক ঘটনা প্রায়ই ঘটছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে মুক্ত। তিনি বলেন, এটাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রগতিশীলতার পরিচয় ও গর্বের বস্তু।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া হয়েছে। সাড়ে তিন হাজার নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছে এবং কিছু নতুন কলেজ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইংরাজী বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উল্লেখ করে বলেন যে তাঁরা চেয়েছিলেন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। সমীক্ষায় দেখা গেছে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করেছেন। এই সরকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাঁরা দশ পনের জনের মধ্যে স্থান পান তাঁদের পুরস্কৃত করার বন্দোবস্ত করেছে। গণ-টোকাটুকি বন্ধ করে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

গত ৩ এপ্রিল বাংলা বন্ধের দিনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী এই সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

---

## জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে হবে

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গে এগুলিকে রক্ষা করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। চিন্তাধারার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, আলাদা সংগ্রাম ও রাজনীতি থাকা সত্ত্বেও ভারতকে বিচ্ছিন্ন হতে দেব না, —এ ব্যাপারে আমরা বদ্ধপরিকর। নিজেদের সংগ্রাম চলবেই, আবার অন্যদিকে ভারতকে সব সময়েই আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে।

পরিশেষে শ্রীবসু বলেন, ভারত ভাঙতে, ভাঙতে তো এখন তিনটে দেশ হয়ে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। যেটা আছে তাকে অন্তত রক্ষা করবার সংকল্প আমাদের নিতেই হবে। কিছু রাজ্য যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে অন্য রাজ্যগুলির পক্ষেও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিই তাদের টেনে রাখবে। আমাদের দেশ মানে ভারত। ভারতকে ভালবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে হবে।

## জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সভাপতির ভাষণে বলেন, বর্তমানে জাতীয় সংহতির বিপদ বাড়ছে। আমরা ঐক্য ও জাতীয় সংহতিকে রক্ষার পক্ষে। ঐক্যকে আরও দৃঢ় করবার জন্য এবং এই ঐক্যবোধ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে দেবার জন্যই এই সম্মেলনের আয়োজন।

সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তথ্য মন্ত্রী বলেন, দেশের চারিদিকে অশান্তি-অবিশ্বাসের আগুন জ্বলছে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। গত তেত্রিশ বছরে জাতীয় সংহতি কখনও এভাবে বিপন্ন হয়নি। এক ভারত, এক ভারতবাসী হিসেবে থাকতে পারব কিনা বিভিন্ন মানুষের মনে এই সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। কিছু মানুষ দেশকে ছিন্নভিন্ন করতে চায়, অধিকাংশ মানুষ চান ঐক্য বজায় রাখতে। পশ্চিমবঙ্গে এত ভাষা-ধর্ম-বর্ণ সত্ত্বেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে আমরা রুখতে পেরেছি। তার ওপরে ভরসা করেই গোটা দেশের প্রতি আমরা দায়িত্ব পালন করতে চাই।

## সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার তথ্যমন্ত্রীর সতর্কবাণী

ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার বলেন, ত্রিপুরার সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গোটা পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অসুস্থ আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্য ভাঙার চক্রান্ত চলছে। এর পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উস্কানি। সারা দেশেই এই চক্রান্তের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই এই সম্মেলন গোটা দেশের পক্ষেই জরুরী। এই ডাক ছড়িয়ে পড়ুক আসমুদ্রহিমাচল।

## পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ অভিনন্দন-যোগ্য—বিহারের রাষ্ট্রমন্ত্রী

বিহারের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগ্যামেল নবী বলেন, আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও আমরা যে ভারতবাসী এই বোধকে জাগ্রত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী বছরে আমাদের রাজ্যেও এ ধরনের সম্মেলন করব।

## জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করবে —ওড়িশার সংস্কৃতি মন্ত্রী

ওড়িশার সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীযুগলকিশোর পট্টনায়ক বলেন, এ ধরনের সম্মেলন জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করবে।

প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ।

# গণসংগীতের পথিকৃৎ কাজী নজরুল

দিলীপ সেনগুপ্ত

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গণসংগীতের পথিকৃৎ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কারণ তাঁর পূর্বে কোনও সংগীত-কারের সংগীতে শ্রেণী সংগ্রাম অথবা শ্রমিক শ্রেণীর ভাবাদর্শ ও চিন্তা চেতনার প্রকাশ ঘটেনি, এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের যে সময়কালে বঙ্কিমচন্দ্র, ডি. এল. রায়, রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ প্রমুখেরা দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দৃঢ় সংকল্পে যখন দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ একের পর এক সংগীতের মাধ্যমে তৎকালীন বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতে প্লাবন বইয়ে দিলেন তখন নজরুল ইসলাম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক ও তার শোষণ নিপী-ড়ণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামগুলিকে তাঁর সংগীতের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভাবে রূপদান করলেন এবং জনমনে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি করলেন। শোষক ও শোষিতের এই শ্রেণী দ্বন্দ্বমূলক পরিপ্রেক্ষিত সংগীতগুলিই তাঁকে গণসংগীতের পথিকৃৎ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বৈষম্য, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ থেকে উদ্ভূত শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনসাধারণের বিভিন্ন সংগ্রাম থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সারবত্তা ও মহত্বকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলা এবং বাস্তব জগতে মানুষ প্রতিনিয়ত যে সংঘাত ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হচ্ছে তাকে শৈল্পিক রূপদান করাই গণসংগীতের অবশ্য করণীয় কাজ। শ্রমিক কৃষক ও জনগণকে সহজে আকৃষ্ট করা; তাদের চিন্তা-চেতনার উপর স্থায়ী ভাবে দাগ কাটা; জনগণকে প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা জোগানো ও উদ্বুদ্ধ করাই প্রধানতঃ গণসংগীতের সর্ত স্বরূপ। সংগীতের এই সর্ত আশ্চর্য্যজনক ভাবে নজরুল সর্বপ্রথম পূরণ করেছেন—তাইতো তিনি গণসংগীতের পথিকৃৎ।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ভাবধারা এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে গণসংগীতের সৃষ্টির মূলে যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ঘটনা তাঁকে যে খুবই উদ্দীপিত করেছিলো তা তাঁর রচিত অনেকগুলি সংগীতের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কাল-বৈশাখীর ঝড়!"

বিশ্বে নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্মলাভে তিনি উল্লসিত। অত্যাচারী জারতন্ত্রকে পরাভূত করে শ্রমিক শ্রেণী যে বিজয় অর্জন করলো এবং যার বার্তা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো ও সমগ্র মেহনতী মানুষের মনে এক বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে দিলো, নজরুলের ঐ সংগীতের প্রতি ছত্রেছত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তিনি উল্লসিত হয়ে শুনিয়েছেন দেশে দেশে বিপ্লবের আগমন বার্তা—

'আসছে নবীন, জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।'

এই ভাবে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলেন আরও অনেক গণসংগীত—যার মধ্যে 'কারার ঐ লৌহ-কপাট', 'শিকল পরা ছল', 'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল।/ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল', 'চল্ চল্ চল্/ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল', 'ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর কসে লাঙ্গল', '(আমরা) মরতে আছি—ভাল করেই মরবো এবার চল্'; 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা' ইত্যাদি। এর মধ্যে 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' সংগীতটি বীরত্বব্যাঞ্জক ও বলিষ্ঠতায় অদ্বিতীয়। আজও এই গান সমগ্র মেহনতী মানুষকে সমভাবে অনুপ্রাণিত করে। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের অনুরোধে নজরুলই ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক সংগীত এর (ইন্টার ন্যাশনাল) অনুবাদ করেন 'অন্তর-ন্যাশনাল সংগীত' নামে, যার প্রথম কয়েকটি লাইন—

"জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী উঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত॥
যত অত্যাচারে আজি বজ্রহানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥"

এ ছাড়া তিনি শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত লাল নিশান ঊর্দ্ধে তোলার মহান কর্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে 'রেড ফ্ল্যাগ' গানের অনুসরণে নিম্নোক্ত সংগীতটি লেখেন—

"ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।"

এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে লাল নিশান ওড়াবার আহ্বান জানিয়ে তিনি নিজেকেও একজন শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত বলে ঘোষণা করছেন। তাইতো তাঁকে দেখা যেতো বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে, ধর্মঘটে, শ্রমিক বস্তিতে এবং পাশাপাশি কৃষকদেরও সংগ্রামের মাঝে। তিনি এই সব সংগ্রামের মধ্যে থেকে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তেমনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৯২৪ সালে হুগলীতে অবস্থিত হুকুমচাঁদ জুট মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের হিন্দি বাংলা মিশ্রিত সংগীত রচনা করে শুনিয়েছিলেন এবং ঐ একই ভাবে তিনি জন-সন নিকলসন, টিটাগড় পেপার মিল, নদীয়া জুট মিল প্রভৃতি কলকারখানার শ্রমিকদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে গণসংগীতের মাধ্যমে তাদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করতে না পারলে সার্থক গণসংগীত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সংগ্রামে অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলাম গণসংগীত সৃষ্টির চাবিকাঠিটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারই সাহায্যে একের পর এক সৃষ্টির জোয়ারে জনগণকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বোধিত করেছিলেন।

পরিশেষে, অতি বিনম্রচিত্তে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি যা কিনা এই নিবন্ধের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি। আমার অতি শ্রদ্ধেয় অগ্রজস্থানীয় কোনও কোনও সাহিত্যিক নজরুল ইসলামের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' সংগীতটিকে গণসংগীত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আমি বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে ঐ সংগীতটিকে গণ-সংগীতের পর্যায়ে না ফেলে দেশাত্মবোধক বা জাতীয় ভাবোদ্দীপক সংগীত এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। গণসংগীতের সর্তগুলি এই সংগীতটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় নি, যদিও এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি ভূমিকা আছে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' তে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মূলতঃ জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা হয়েছে, যা কিনা গণসংগীতের সঠিক ধর্ম নয়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে যা পরবর্তী-কালে কখনও করা যেতে পারে।

# পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে বিতর্ক ঃ আমি যেমন দেখেছি

—ডঃ ডি. পি. পট্টনায়ক

পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার সমস্যা অন্যান্য ভাষাভাষী রাজ্য সমূহে ইংরেজি শিক্ষার সমস্যা থেকে পৃথক নয়। কিছু কিছু লোকের এখনও বিশ্বাস ভারতবর্ষে ইংরেজি বিদেশী ভাষা নয়; ইংরেজি ভারতীয় ভাষা এবং প্রায়শঃই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নিম্নস্তরের প্রাথমিক শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যাবে শিক্ষকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, শিক্ষার উপকরণ অপর্যাপ্ত এবং শিক্ষা প্রণালীও সেকেলে।

ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে কিনা, দেওয়া হলে তা শিক্ষার কোন স্তরে শুরু হবে এবং শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য সাধনে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে পশ্চিমবঙ্গে এটা জিজ্ঞাস্য নয়। কোন স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সারা পৃথিবীর মনীষীরা চিন্তা ভাবনা করছেন। এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ কয়েকটি ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। শৈশবে দুইটি ভাষা আয়ত্ত করার কার্যকারিতা সম্পর্কে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞগণ একমত। বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে-ও প্রায় একমত যে ৬ থেকে ৯ বছরের শিশুদের রীতি মাফিক শিক্ষা দানের আগে এবং রীতি মাফিক শিক্ষা দান শুরু করার সন্ধিক্ষণে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা উপযোগী নয়। বয়ঃসন্ধি কালের দুইটি ভাষা শিক্ষার রূপ শৈশব কালের দুইটি ভাষা শিক্ষার রূপের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। এংগেল (১৯৭৫) শিশুদের দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দান উপযোগী গ্রহণযোগ্য সময়ের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বলেছেন "লাদো (১৯৬৪) লক্ষ্য করেছেন যে ইস্কুলে যাওয়ার আগে শিশুরা মাতৃভাষার মতই একটি ভাষা শিখতে পারে। লাভালে (১৯৭৩) ফরাসি শিক্ষারত ৩৯ জন ইংরেজি ভাষী ছেলেমেয়েকে জেনেভায় পরীক্ষা করেছিলেন। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের তুলনায় স্কুলে যাওয়ার আগের ছেলেমেয়েরা নতুন ভাষায় আরো সুন্দর কথাবার্তা বলতে পারে। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের বিকাশের মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে, তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা শেখা কষ্টসাধ্য; হয় তারা ঐ ভাষায় কথা বলতে চায় না অথবা ঐ ভাষায় তারা সম্পূর্ণ বাক্য গঠন না করে অসমাপ্ত কথা বলে। কিন্তু, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার শুরুতে অথবা নিয়ম-মাফিক শিক্ষা শুরুর আগে (আনুমানিক নয় থেকে বারো বছরের মধ্যে) দ্বিতীয় ভাষায় দ্রুত কথাবার্তা বলতে পারায় উন্নতি ঘটতে দেখা গেছে। স্টেম (১৯১৩) সুইডেনের ছেলেমেয়েদের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য ভাবে একই তথ্য দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, সাত বছরের ছেলেমেয়েদের তুলনায় এগারো বছরের ছেলেমেয়েরা বেশি তাড়াতাড়ি শিখতে পারে; বোধশক্তি ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে তারা দ্রুত। গিলস (১৯৭১) অনুমান করেন যে দুইটি ভাষা শিক্ষা দানের পদ্ধতির ব্যাপারে শিশুর ধারণ ক্ষমতার উপরই ভিত্তি করে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময় স্থির করা যায়; তিনি ভবিষ্যদ্বানী করেন যে মাতৃভাষা শিক্ষার আগে শিশু দুইটি ভাষার মধ্যে যতটা বাধার সম্মুখীন হবে (৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ঐ সময়ের পরে ততটা বাধা সে পাবে না।"

একথা অনস্বীকার্য যে, দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে গবেষণা মূলক তথ্য সীমিত প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি, ক্ষমতা, ভাষা ও শিক্ষার অবস্থা এবং ঐ বিষয়ে গবেষণালব্ধ উপরের যাবতীয় তথ্যের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক স্তরের পরে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি বেশী যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

---

## তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীদের বার্ষিক সভা

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৫ এপ্রিল কলকাতার শিশির মঞ্চে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শ্যামল মৈত্র তাঁর ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে কর্মচারীদের সাংস্কৃতিক জীবনে অফিস ক্লাবের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বিগত বছরে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রেমচন্দ শতবর্ষ উদ্‌যাপন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা এবং 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা' বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান, সপ্তপর্ণী পত্রিকা প্রকাশ প্রমুখ নানাবিধ কৃতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপের উল্লেখ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি বিভিন্ন সদস্যের আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং আগামী বছরের জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়রতন চৌধুরী, শ্যামল মৈত্র, দুলাল মিত্র ও আবদুর রশিদ যথাক্রমে সভাপতি, সহ সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে এবং কার্যনির্বাহক সদস্য হিসাবে অলোক রায়, জয়ন্ত সরকার, বাসন্তী গুহঠাকুরতা, পলাশ মজুমদার, অশোক দে, সম্পদ নায়ক ও শকুন্তলা চক্রবর্তী সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন। বিদায়ী সভাপতি ভবতোষ তপাদার বিগত বছরের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

সভার শেষে উৎপল দত্ত পরিচালিত, প্রাক-স্বাধীনতা যুগের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, মুক্তি প্রতীক্ষিত 'বৈশাখী মেঘ' চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

## যুব উৎসব ১৯৮১

গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি '৮১ বাঁকুড়া জেলার রোল হাই স্কুল মাঠে ইন্দাস ব্লকের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুফী মুজিব আমেদ পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন। উৎসবে ১৫০ জন ক্রীড়া প্রতিযোগী এবং ১৩৬ জন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের শেষ দিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুফী আনিসুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন বিধানসভার স্থানীয় সদস্য বদন বোরা।

# কবি কাজী নজরুল ইসলাম

দর্শন চৌধুরী

'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ কবিতা নয়, সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা। কিন্তু এটি তাঁর কাব্যজীবনের মেনিফেস্টো বা ইস্তাহার এই কবিতার একটি পংক্তি, শুধু এই কবিতার নয়, তাঁর বিদ্রোহী কবি-সত্তারও প্রাণকেন্দ্র : 'আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।'— বৃটিশ শাসিত তখনকার পরাধীন বাংলাদেশের জীবন— সেতো জাহান্নমের অর্থাৎ নরকের জীবন। তারই অগ্নিদাহে বসে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। নজরুলের কবিমানস এরই প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা ব্যক্তি জীবনের মর্মজ্বালা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয় তখন নজরুলের ছয় বৎসর বয়স। বর্ধমানের এক অখ্যাত গ্রামে প্রায় নিঃস্ব পরিবারে পিতৃহীন নজরুল পড়াশুনার চাইতে জীবিকার তাগিদে অনেক বেশি ব্যস্ত। কখনো স্কুলে পড়া, কখনো গাঁয়ে লেটোর দলে গান বাঁধা, ও ঘুরে বেড়ানো, কখনো রুটির দোকানে কাজ করা, কিংবা রেলের গার্ড সাহেবের বাবুর্চি হওয়া — এইভাবে নিয়ত জীবনযুদ্ধে নজরুল ক্রমশঃ বড়ো হয়ে উঠেছেন। আর সারাদেশে তখন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণ ও শাসন ভারতবাসীর জীবনযাত্রা দুর্বিসহ করে তুলছে। ১৯ শতকের শেষদিক থেকেই শিক্ষিত বাঙালীর মোহভঙ্গ হয়েছে, ইংরেজের স্বরূপ তারা বুঝতে পারছে, বঙ্গভঙ্গে তা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। এই সময়েই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তার সশস্ত্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ইংরেজও চরম প্রতিহিংসায় দমন পীড়নে উদ্দাম হয়ে উঠল। বাঙালী যুবকে জেলখানা ভরে গেল, অসংখ্য যুবক ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। আন্দোলনের চাপে পড়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হলেও, ইংরেজ আরো শক্ত হাতে নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে দিল। বিপ্লবী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হল। তখনকার প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এমন সময়েই, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বাঙালীর আন্দোলন থমকে গেল। বড় লাভের আশায় জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধের সময় ইংরেজকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। সারাবিশ্ব জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে পরাধীন ভারতের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিলনা। কিন্তু পরাধীন দেশের দুর্ভাগ্য, যুদ্ধ মিটলে সে পরোক্ষে এই যুদ্ধের বিষময় ফলগুলি পেতে শুরু করল। অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারী, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, নৈরাশ্য, দেশের মানুষের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে লাগল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) ভাঁওতায় ইংরেজ কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে চাইল; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই ঐ ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে গেল, কংগ্রেস এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। দেশব্যাপী আবার প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হল। ইংরেজ কুখ্যাত 'রাউলাট অ্যাক্টের' (১৯১৯) দ্বারা তার শাসনের নগ্নরূপ প্রকাশ করল। বিনাবিচারে বন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করে,— সবাই নিবিচারে হয়ে যেতে লাগল। এই সময়েই (এপ্রিল, ১৯১৯) পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার সমাবেশে গুলি চালিয়ে ইংরেজ জহ্লাদের নিষ্ঠুরতার দেখাল। সমগ্র দেশ শিউরে উঠল। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরলেও শাসনের অত্যাচারের ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করলনা। রবীন্দ্রনাথ তখনই পাঞ্জাবে ছুটে যেতে চেয়েছেন, মোহনদাস গান্ধী তাঁকে বারণ করলেন, সারাদেশের মূক মানুষের হয়ে রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করলেন ইংরেজ প্রদত্ত 'নাইটহুড' পরিত্যাগ করে।

বিশের দশকের শুরুতেই মোহনদাসের নেতৃত্বে সারাদেশব্যাপী অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল। আমেদাবাদে সুতাকলে ধর্মঘট হল, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনে সারাদেশ প্রতিবাদে হরতাল পালন করল, ছাত্রধর্মঘট, বয়কট — ভারতবর্ষ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল। আবার বৃটিশের জেলখানাগুলি ভরে গেল, জেলবন্দীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল, বরিশাল, ফরিদপুর জেলে নির্মম অত্যাচার ও তার প্রতিবাদে জেলবন্দীদের জেলের ভেতর আন্দোলন ও অনশন— শাসনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে উন্মাদনার বিচিত্র রূপ। নতুন করে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার শুরু হল।

কবি নজরুলের ব্যক্তিজীবন বেড়ে উঠেছে এই উন্মাদনার মধ্যেই, ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের ভয়ঙ্কর পরিণাম গ্রামবাংলার এক নিঃস্ব পরিবারে, যে বাড়িতে প্রথম পুত্র-সন্তানের নাম রাখতে হয় দুঃখী মিঞা! দেশের উত্তাল ঢেউ বর্ধমানের চুরুলিয়া কিংবা সিয়ারশোলের বুকেও আঘাত হেনেছে। দশম শ্রেণীতে পড়বার সময়েই একদিকে জীবিকা ও অন্য দিকে যুদ্ধের উন্মাদনা ও লড়াইয়ের প্রস্তুতির জন্য, নজরুল বৃটিশের ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে নাম লিখিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চলে গেলেন যুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন একটি প্রচণ্ড ঘটনা, তেমনি এই সময়েই আরেকটি ঘটনা বিশ্বময় আলোড়ন তুলল। রাশিয়ায় বলশেভিক আন্দোলন ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লব। সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জারের অত্যাচার থেকে মুক্তি ও মুক্ত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর অতি সন্নিকটেই যুদ্ধশিবিরে থাকাকালীন নজরুল এই খবর গোপনে রাখতেন এবং লালফৌজের বিজয় অভিযানে নিজে উল্লাসে ফেটে পড়তেন। সর্বহারা মানুষের এই সাফল্যে তিনি উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন, তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পে নায়ক দারা এই লালফৌজে যোগদান করে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে।

বিশ শতকের গোড়াকার এই পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব। বাংলাদেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি ও নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রস্তুতি— এই দুয়ের প্রেক্ষাপটেই নজরুলের সাহিত্য বিচার করতে হবে। নজরুল যখন কাব্যরচনায় কলম ধরেছেন তখন বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ করছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি রাজসিংহাসনের উচ্চাসন থেকে বারবার নেমে আসতে চেয়েছেন জনতার মাঝে; সেই জীবনের রুদ্ধশ্বাস

তাঁকেও বিচলিত করেছে। নির্জীব, হীনবীর্য বাঙালী জীবনের অসহায়তা তাঁকে পীড়িত করেছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নিজে গান বেঁধে জনতার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা সবার জানা। যুদ্ধের প্রাক্কালীন 'সবুজপত্র' পত্রিকায় যৌবনকে তিনি চিরজীবী আখ্যা দিয়ে তাকে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন, হতবীর্য আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার প্রার্থনা করেছেন। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এই মূল্যহীন অসারত্বের কথা তোলা হয়েছে। নিজের জগতের পরিমণ্ডলের মধ্যে এগুলি না পড়লেও সমসাময়িক জনজীবনের এই নতুন প্রাণস্পন্দনে সামিল হবার চেষ্টা করেছেন নিজে, 'এবার ফিরাও মোরে' কিংবা পরবর্তী 'ঐকতান' কবিতায় যে আকাঙ্খা রূপ পেয়েছে। নিজে যা পারছেন না তার জন্য বিচলিত হচ্ছেন, নতুন সম্ভাবনাময় কবির প্রত্যাশা করছেন,— মাটির কাছাকাছি থেকে নতুন যে কবি মূক মানুষের ম্লান বেদনার কথা, উৎপীড়িত জনগণের ব্যথার কথা কাব্যে লিখবেন।

অথচ তখনকার কোন কবির কাব্যেই তা পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের বেশির ভাগই রবীন্দ্র সৌর জগতের আশেপাশেই ক্ষীণভাবে প্রদক্ষিণ করেছেন এবং স্বভাবতই বিরাট প্রতিভার কাছে হারিয়ে গেছেন। সারাদেশব্যাপী যখন এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ এবং বাঙালী যখন ফেটে পড়তে চাইছে বিক্ষোভে, তখন রবীন্দ্রানুসারী এই কবিবৃন্দ (সত্যেন্দ্রনাথ, সাবিত্রীপ্রসন্ন, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়) তা থেকে মুখ ফিরিয়ে গৃহের সুখ ও প্রেম, পল্লীজীবনের ফেলেআসা আনন্দ, গার্হস্থ্যপ্রীতি ও গৃহগত প্রাণের সুখে বিভোর হচ্ছেন। তার মধ্যে সত্যেন দত্ত ও কিছু অংশে সাবিত্রী প্রসন্ন জাতীয়তার রোমান্টিক চিন্তায় আবদ্ধ হয়েছেন এবং মধ্যবিত্তসুলভ ১৯ শতকীয় ভাবনায় দুলেছেন। সত্যেন দত্তের ছন্দের দোলা তাঁকে রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু স্বতন্ত্র করলেও, সবাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই হারিয়ে গেলেন।

এই সময়ের দুজন কবি, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ভাবনার জগতে একটু নতুনত্ব নিয়ে এলেন। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব থেকে আত্মমুক্তি ঘোষণা করলেন। মোহিতলাল রবীন্দ্র-বিরোধিতা করতে গিয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে তন্ত্রধর্মী দেহবাদী হলেন, রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে অস্বীকার করে তিনি দেহের সীমানাকেই মেনে নিলেন। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সত্যশিবসুন্দরের ধারণাকে প্রতিবাদ করলেন, আনন্দবাদের পরিবর্তে 'দুঃখবাদ' বড় করে তুললেন। জীবনে আনন্দের চাইতে দুঃখই যে বড় তা দেখালেন, সেই সঙ্গে দুঃখীমানুষের বেদনার কথাও বললেন। সে যুগে যতীন্দ্রনাথ জনমানসের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রকাশের গদ্যধর্মী স্বচ্ছতা, চমক ও ভাবনার বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে নতুন স্বাদ এনে দিল। কিন্তু এসব ভাবনাইতো রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসেবে, জনগণের প্রাণের কথা সে যুগের প্রেক্ষাপটে কোথায়? মানুষের সর্বাংশে দুঃখের কথা বললেও, সে দুঃখের মূল কোথায়, কিংবা সেই অত্যাচারীর স্বরূপ কি, কিংবা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই বা কোথায়? এসব কথাই তো তখন সারা বাংলার জনগণ প্রাণের গভীর থেকে বলতে চাইছেন।

আত্মাভিমানী মোহিতলাল জনতার প্রাণকে স্পর্শ করতে পারলেন না। যতীন্দ্রনাথ দুঃখীবাদী হতে গিয়ে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়লেন। মোহিতলাল ক্রমশঃ আনন্দ, সত্য, সুন্দরের পূজারী হয়ে পড়লেন; সত্য সুন্দরের ছদ্মবেশে হয়ে পড়লেন রক্ষণশীল ও প্রাদেশিক। যতীন্দ্রনাথ, 'মরীচিকা', 'মরুশিখা'র মরুজ্বালা অতিক্রম করে 'ত্রিযামা কি 'নিশান্তিকা'য় সহজ সুন্দর জীবনের আনন্দের অনুধ্যানে নিজেকে বিসর্জন দিলেন।

এই সময়েই নজরুল কাব্যের ক্ষেত্রে এলেন পাঁচটি ব্যতিক্রম হয়ে।

এক. একেবারে গ্রাম বাংলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে 'মাটির কাছাকাছি কবি হয়ে।

দুই. সার্থক অর্থে সর্বহারা তিনি, এত নিরস্ব কোন কবি বাংলা কাব্যে অসময়ে আসেননি।

তিন. ধর্মে ইসলাম—কিন্তু মনে ধর্মমুক্ত।

চার. ভাষা ও প্রকাশে কোন শিক্ষিতাভিমান নেই—'সৌখীন মনসুরী' নেই।

পাঁচ. শোষক ও শোষিতের নিরন্তর লড়াইয়ে অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়ে কলমকে আন্দোলনের হাতিয়ার করে নিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই নতুন কবিকে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন:

'দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন।'

বললেন: 'অরুণ্য বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা তার অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোন ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের উর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে।'

শুধু বৃটিশ শাসনের জ্বালা নয়, দীর্ঘ পরাধীনতার অভিশাপে সমাজজীবনে যে সমস্ত প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক বেড়ে উঠেছে, পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার সব কিছুকে তিনি ভেঙে ফেলতে চান। বৃটিশ শাসনের অত্যাচার, অত্যাচারিত ভারতবাসীর বেদনা ও বিক্ষোভ; সমাজশোষণ ও অসাম্য, ধর্মীয় ভেক ও তার অন্ধতা, অজ্ঞতা ও শোষণ, অর্থনৈতিক দাসত্ব ও নীচুতলার পীড়িত মানুষের দীর্ঘকালীন মর্মজ্বালা, নারীর অমর্যাদা, জোতদার ও জমিদারের অত্যাচার ও শোষণ, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী, আন্দোলনের নামে বৃটিশ তোষণ, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি,—এসবই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু এবং এগুলিই এই দীর্ঘযুগ সঞ্চিত পুঞ্জিত পাষাণভারকেই তিনি উড়িয়ে ফেলতে চান। এবং শান্ত হবেন সেদিনই—

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না'—

কিংবা—'শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখে মুক্ত হোক'

এবং এই সমস্তকে ভেঙে ফেলা শুধু ধ্বংসের জন্য নয়, সে যে 'প্রলয় নূতন সৃজন বেদন'—এবং তিনি যে নবসৃষ্টির মহানন্দেই' অবহেলে অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চান, 'বিদ্রোহী'তেই তা বলে নিয়েছেন। 'ভাঙার গান' আলোচনা প্রসঙ্গে একটি চিঠিতেও বলেছেন —'ঐ নতুন করে গড়ার আশাতেই তো যত শীঘ্র পারি ভাঙি।'

একথা ঠিক, নজরুল তাঁর কবিতা ও গানে সারা বাংলার সাধারণ মানুষের প্রাণের উদ্দীপনাকে প্রত্যক্ষ ও ঋজুভাবে প্রকাশ করলেন। তাইতো সেই সময়কার অন্য সব কবিদের ব্যর্থপ্রাণের আবর্জনায় ফেলে দিয়ে, জনচিত্ত নজরুলকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। নজরুল তাঁর 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ বলেছেন:

'মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায় মোরা বলি বাঘ খাও হে ঘাস
হেরিনু জননী ভিক্ষা মাগিছে ঘরে ঢেকে রেখে ছেলের লাশ'—

এই যখন দেশের অবস্থা তখন আর কি বলা যায়? বড় বিষজ্বালা বুকে নিয়ে এসব দেখে শুনে তিনি ক্ষেপে গেছেন। এসব থেকে চোখ ফিরিয়ে অথাকথিত অমর কাব্য লেখবার তাঁর প্রবৃত্তি নেই। তিনি বর্তমানের কবি, 'ভবিষ্যতের নবী' হতে চান না। বলেছেন:—'অমর কাব্য

তোমরা লিখিও বন্ধু যাহারা আছ সুখে।'—জাহান্নমের আগুনে যখন দেশ পুড়ছে তখন যে কবি বা সমালোচক তাকে ভুলে থাকতে চান, ইতিহাসে তাদের স্থান আস্তাকুঁড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত পরিবেশে সুকান্তও বলেছিল :

নেই অমরত্বের লোভ
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।

সুকান্ত অনেক বেশি সংগঠিত ও মার্কসীয় চিন্তা ভাবনায় শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ। নজরুল তাঁর সীমাবদ্ধ চেতনা সত্ত্বেও সমাজের শোষণের মূল কোথায় এবং একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বাঙালীর জীবনে যে অভিসম্পাত গড়ে তুলেছে, তা তিনি ধরতে পেরেছিলেন। রাশিয়ার সর্বহারার বিপ্লব এবং বাংলার শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন, কমরেড মুজফফার আহমেদের সাহচর্য তাঁকে শুধুমাত্র উদভ্রান্ত 'বিদ্রোহী' করেনি, সর্বহারায়' সাম্যবাদী কবিতা লিখিয়েছে, শ্রমিক-কৃষকের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। একথাগুলি মনে রাখলে নজরুলকে পারম্পর্যহীন বিদ্রোহী, কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্মীয় কিংবা লীলাবাদী প্রেমের কবি হিসেবে যাঁরা প্রচার করতে চান, তাঁদের মুখোশ খসে পড়তে বাধ্য। তবে একথা ঠিক, নজরুলের কাব্যে যে দ্বিধা, সুকান্তের কাব্যে তাই দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত। নজরুলের জেহাদ :

'শোন অত্যাচারী শোনরে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁগ সবে আজ'

সুকান্তের শপথ :

'শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়
জবাব কি দিবি তার।'

তারপরেই ঐতিহাসিক ঘোষণা :

'আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেঁউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।'
বিপ্লবের অগ্রচারী নজরুলের সার্থকতা সুকান্তের আবির্ভাবে।

নজরুলের কাব্যরীতিতে ত্রুটি অনেক, তার ভাষায় ও গঠনে এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগে কিন্তু একটা সমগ্র দেশের মানুষের প্রাণের উদ্দীপনা-কে প্রত্যক্ষ ও ঋজু ভাবে প্রকাশের বিকল্পও তো চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি এই কবি ও তাঁর কবিতায় ও গানে প্রত্যক্ষ করে সেদিন সাদরে সমগ্র বাঙালীর মনোভাব নিয়েই নজরুলকে বরণ করে নিলেন বাংলা সাহিত্যে। 'বসন্ত' নাটিকাটি তাঁকে উৎসর্গ করে উৎসর্গ পত্রে ছাপার অক্ষরে লিখলেন : 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম।' কাব্য-ভাবনায় ১৯ শতকীয় ভাবধারা যারা কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তাঁরা তখন এ ব্যাপারে খুঁত খুঁত করেছিলেন, এখনো অনেক সমালোচক কাব্যে জনতার প্রাণের কথা ও সে যুগের অত্যাচারের প্রতি-বাদের অন্তরতম কথাগুলিকে কাব্য বলে মানতে ঐ খুঁত-খুঁত করেন। তারা কাব্য বলতে প্রেম ও প্রকৃতি বোঝেন। আমার এক সহকর্মী মাস্টার মশাই ছিলেন, যিনি সব কাব্যেই 'শাশ্বত' খুঁজতেন, ছেলেরা তাঁকে বলত 'শাশ্বত স্যার'। এই শাশ্বত স্যারেরা জানেন না যে, জীবনে কোন কিছুই শাশ্বত নয়, কাব্যে তো নয়ই। সমকালীন জীবন ও যুগ চেতনাকে যিনি অস্বীকার করে আধিভৌতিক চিরন্তন ও শাশ্বতের সন্ধান করেন, তিনি কখনোই শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ কবিরা সম-কালীন যুগ যন্ত্রণাকেই গ্রহণ করেন এবং মানুষের সেই অব্যক্ত প্রাণের কথাকেই কাব্যরূপ দেন। জনগণ তাঁকেই নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করেন এবং মানুষের সেই অব্যক্ত প্রাণের কথাকেই কাব্যরূপ দেন। জনগণ তাঁকেই নিজেদের কবি বলে গ্রহণ করে। কেননা, জনগণও আয়না ব্যবহার করে। শাশ্বত-সন্ধানী ভাববিলাসী কবিদের আশ্রয় হয় শুধুমাত্র উপাধিলোভী কৃমি ঘাঁটা গবেষকদের ততোধিক দুরস্পর্শ গবে-ষণার মধ্যে। পঞ্চাশ বছর পরেও জনগণের প্রাণ থেকে নজরুলকে সরানো যাচ্ছে না যখন, তখন সেই সমালোচকেরাই তাঁর বিদ্রোহী সত্তার গান ও কবিতাকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রেমের কবি আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রেমের গান ও কবিতাগুলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাইছেন। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন বলেই তাঁর স্তাবক ও খুঁতখুতে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেছিলেন : 'নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে কবি বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এ মনোভাব পোষণ করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করেনি, অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র।......কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না এও তোমাদের অদ্ভুত আবদরে বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈকি। আমি যদি তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।'—এরপরে আর কি বলার থাকতে পারে?

একটা কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিই। বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভারতে নজরুল একমাত্র কবি যিনি কাব্য রচনার জন্য শাসকের কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। এবং তার জন্যে তাঁর দুঃখও হয়নি, অনু-শোচনা তো নয়ই। দীপাবলী সংখ্যায় মুণ্ডমালিনীকে আহ্বান করে সেই কবিতায় লিখেছিলেন :

'দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কবে সর্বনাশী।'

একে ধর্মীয় কবিতা নয়, কার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাদের আহ্বান করা হচ্ছে, একথা বুদ্ধিমান বৃটিশের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। তাই নজরুলকে সামলানোর প্রয়োজন হয়ে ছিল। অথচ 'সব্যসাচী' কবিতায় শেষে যখন নজরুল বলেন :

'মেনে শত বাঁধা টিকিটিকি হাঁচি
দাড়ি-কাছা নিয়ে আজো বেঁচে আছি
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী
যাহোক একটা কিছু হাতে দাও একবার মরে' বাঁচি।।'

তখন সেটা বুঝে নিতে কিংবা বুঝে উঠতে ভারতবাসীর বড় দেরী হয়ে যায়। তবে একথা ঠিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষ যখন রুখে উঠে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সাথী করে নিতেই হয়।

# যুবমানসে নজরুলের প্রভাব ॥ শ্যামল মৈত্র

বলরে তোরা বল্ নবীন
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ !
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন
চায় না এরা-হই স্বাধীন !
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ ফরাজ কেবল ছল
ফাঁকা প্রেমের ফুস্‌মন্তর মুখ সরল আর মন গরল ।
( বিদ্রোহীর বাণী )

নজরুলের রচনার মধ্যে যে আবেগ এবং প্রাণবন্যা ছিল তা একদিকে যেমন যুবমানসে প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে তেমনি ইংরেজ শাসক ও রক্ষণশীলদের মনে তীব্র আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল। তাঁর কবিতা ও গান এদেশের অসংখ্য যুবককে মুক্তি সংগ্রামে টেনে এনেছে, আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করেছে। যুবসমাজে তিনি যে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, তার কারণ শুধু তাঁর কবিমানস নয়, ব্যক্তিমানসেও তিনি তৎকালীন যুবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হতে পেরেছিলেন। বালক বয়সে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম, মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ষোল বছর বয়সে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য অদম্য আকূতি ও আবেগ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক অভিব্যক্তি ইত্যাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যুবসমাজকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল।

নজরুল ছোটবেলা থেকেই বোহেমিয়ান প্রকৃতির ছিলেন বলে এক-ধরনের অপপ্রচার চালান হয়। সাত/আট বছর বয়স থেকেই যাকে ক্ষুধার তাড়নায় রুটির দোকানে কাজ করতে লেটোর দলে গান গেয়ে বেড়াতে হয়, তাকে বোহেমিয়ান বললে দারিদ্র্যকে অপমান করা হয়।

নিতান্ত বালক বয়স থেকেই রুজি রোজগারের জন্য প্রচণ্ড কায়িক শ্রম করতে হলেও লেখাপড়া শেখার প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহ ছিল বলেই তিনি একটু বেশী বয়সে হলেও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ডবল প্রমোশন পেয়ে মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক শিক্ষক হিসাবে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে খুবই সাহায্য করেছিলেন। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, শৈশবে পিতৃহারা, মাতৃস্নেহ থেকেও প্রায় বঞ্চিত হবার ফলে নজরুলের মধ্যে আবেগপ্রবণতার প্রাবল্য ছিল। তাকে বোহেমিয়ান বলে অপব্যাখ্যা করার কোনো কারণ নেই। তাঁর যখন মাত্র ৮।৯ বছর বয়স, জ্ঞানোন্মেষের সেই প্রথম প্রহরেই ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখের আত্ম-দানের ঘটনা তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তখন থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি জীবন পণ করেছিলেন। যদিও তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আপসের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের উপায় খুঁজছিলেন, ব্রিটিশরাজকে খুশি করার জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে প্রাদেশিক নেতারা বেঙ্গলী রেজিমেন্ট গঠন করার জন্য দাবি তুললেন। দাবি না বলে আবদার বলাই ভালো। বাঙালীরা ইংরাজের হয়ে যুদ্ধ করা থেকে বঞ্চিত থাকবে, অথচ অন্যান্য প্রদেশের মানুষ সেই সুযোগ পাবে—তা তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন না। সরকার বেঙ্গলী রেজিমেন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলে প্রাদেশিক নেতা বাঙালীর শৌর্য বীর্য প্রমাণ করার জন্য ঐ সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য যুবসমাজকে আহ্বান জানালেন।

নজরুলের তখন ষোলো বছর বয়স। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন, সকলের প্রত্যাশা সে নিশ্চয় বৃত্তি পাবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে নজরুল চলে গেলেন সৈন্যবাহিনীতে। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে যে নজরুল হয়ত কংগ্রেস নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ, বিশেষতঃ তাঁর গ্রাম চুরুলিয়ার অধিবাসীদের একাংশ, এমন কথাও রটনা করেন যে নজরুল ব্যর্থ প্রেমের আঘাতে দেশ ছেড়েছিলেন। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি তাঁর আগ্রহ কি বিপুল ছিল তার প্রমাণ তাঁর কথাতেই বলা যায়—"স্থির হল, অস্ত্রশস্ত্র চালনা না শিখলে ইংরাজকে তাড়ানো যাবে না। অতএব ইংরাজের সৈন্যদলে ঢুকে সব কিছু উত্তমরূপে শিখে, দেশের তরুণদের শিখিয়ে ইংরাজকে ঘা দিতে হবে।" ( কাজী নজরুল : প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩ ) এই চিন্তা ব্যাপকভাবে সংগঠিত সচেতন রূপ লাভ করলে দেশের রাজনীতি সেদিন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করত।

করাচীতে সৈন্যবাহিনীতে তিনি প্রায় চার বছর ছিলেন। এই সময়-কালে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা কিভাবে কোন সূত্রে পরিণতি লাভ করে তার তথ্য প্রমাণ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ দেখা যাচ্ছে, সৈন্য-ব্যারাকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। "নজরুলের আড্ডা থেকেই কয়েকজন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংবাদ দিত, যেমন আইরিশ বিদ্রোহ ও রুশদের কথা। একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, নজরুল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস করতেন, তাঁদের এক সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করেন। দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল।...নজরুল সেদিন যেসব গান গাইবেন ও প্রবন্ধ পড়লেন, তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

[ শম্ভু রায়ের পত্রাবলী : কাজী নজরুল, পৃঃ ১২৬ ]

নজরুল ১৯২০ সাল নাগাদ করাচী থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু

স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় গেলেন না। কোনদিনই আর যাননি। তিনি এসে উঠলেন কলকাতায় ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে মুজফ্ফর আহমেদের আস্তানায়। এর কিছুদিন পরে ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেন। কবি তখন ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়িতে থাকতেন। সারা রাত জেগে কবিতাটি রচনা করে ভোরবেলায় শোনালেন বন্ধু মুজফ্ফর আহমদকে ঘুম ভাঙিয়ে। কবিতাটি 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই আলোড়ন সৃষ্টি করল। যুবসমাজ নতুন করে তাদের শক্তির উপর আস্থা ফিরে পেল। একটি কবিতার মধ্য দিয়েই তিনি খ্যাতির শীর্ষে উঠে গেলেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক বিনয় সরকার কবিতাটি ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। দেশের বিপ্লবী নেতারা তাঁকে অভিনন্দিত করলেন, বিশেষতঃ ভূপতি মজুমদার ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। যুগান্তর দলের তরুণরা তাঁকে সাথী হিসেবে পেতে চাইল।

বিদ্রোহী কবিতা রচনার কিছুদিন আগেই নজরুলের সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যুবরাজ আসছেন ভারতভ্রমণে। প্রতিবাদে আহূত হল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। কবি তখন কুমিল্লায়। তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে ফেললেন, "সাবধান, সাবধান / আসিছে তাদেরি রাজকুমার / ওগো নির্ভীক পুরবাসী আজ খুলোনা দ্বার / খুলোনা দ্বার" এবং কয়েকজন যুবক-যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহরের পথে পথে গান গেয়ে প্রচার আন্দোলন তুঙ্গে তুললেন এবং ধর্মঘট সফল করলেন।

১৯২১ সাল থেকেই নজরুলের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই সময় প্রকাশ করলেন ধূমকেতু পত্রিকা। তার প্রকাশ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠালেন, "আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু ; / দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।/ অলক্ষণের তিলকরেখা/রাতের ভালে হোক না লেখা/জাগিয়ে দে রে চমক মেরে/ আছে যারা অর্ধচেতন।" নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের মুখ চেয়ে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখেছিলেন। এই সময়ে সেই আন্দোলন যে আবার মাথা তুলল। তাতে ধূমকেতুর এবং নজরুলের বিশেষ অবদান ছিল। যুগান্তর গোষ্ঠী এটিকে তাঁদের মুখপত্র হিসেবে দাবি করতেন। নজরুল তার প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলেন। "আমি যুগে যুগে আসি/আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু/এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।"

ধূমকেতুর অফিস ঘরে সর্বদাই ভিড় লেগে থাকত। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সম্পাদকীয় দপ্তর নিয়ে যাওয়া হল ৭নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির দুটি বাড়ি পরে। কাগজ যা ছাপা হত। চাহিদা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। যুবসমাজকে বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার কাজে ধূমকেতুর ছিল উজ্জ্বল ভূমিকা। এর অগ্নিস্রাবী সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি যুবসমাজকে জাগিয়ে তুলল ঃ

"হে আমার তরুণ পথ-যাত্রী দল, ওরে আমার রক্ত-যজ্ঞের পূজারী ভায়েরা। বল, তোরাও কি আজ সৌন্দর্যাহত রূপ-বিমুগ্ধ পথ-হারা পথিকের মত মৌন নির্বাক চোখে ঐ ভৈরবী রূপসীর পানে চেয়ে থাকবি ? উত্তর দে— ……"

[ পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ? দুর্দিনের যাত্রী ]

এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে শারদ সংখ্যার জন্য নজরুলের কাছে একটি লেখা চাওয়া হয়। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি তিনি তাঁদের দেন। কবিতাটি দীর্ঘ, শুরুটা এই রকম ঃ "আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলায় মূর্তি-আড়াল/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল/দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবকদের দিচ্ছে ফাঁসি/ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী।" আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালে স্বদেশী হিসেবে নাম ছিল। কিন্তু এত গরম কবিতা তাঁরা ছাপতে সাহস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত ধূমকেতু পত্রিকাতেই তা ছাপা হল। স্বভাবতই পুলিশের নজর পড়ল। পরবর্তী সংখ্যায় 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ীকে' শীর্ষক নিবন্ধটি লেখার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল কুমিল্লা থেকে। ধূমকেতু বাজেয়াপ্ত হল আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা এক অনন্য সাহিত্যসৃষ্টি। "রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন করে খৃষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিন ভগবান নীরবে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় নি। তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নৈলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।"

[ রাজবন্দীর জবানবন্দী ]

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে কবিকে হুগলি জেলে নিয়ে আসা হয়। এই সময় তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। দেশের যুবসমাজ আজকাল যেমন ফিল্ম স্টারদের অনুকরণ করে আনন্দ পায়, তৎকালে নজরুলের পোশাক পরিচ্ছদ, চুল ছাঁটা ইত্যাদি নকল করত। আজকালকার ছেলেদের মুখে যেমন ফিল্ম স্টারদের আমদানী করা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, সাধারণ মানুষ যা বুঝতে অক্ষম, সেই সময়েও অনুরূপভাবে কতকগুলি অদ্ভুত বাক্য যুবকদের মুখে মুখে ফিরত। সেগুলি হল 'চালাও পান্সি বেলঘরিয়া', 'দে গরুর গা ধুইয়ে', 'ঘি চপ্‌চপ কাবলি মটর' ইত্যাদি এবং এর স্রষ্টা ছিলেন নজরুল। নজরুলকে যখন হুগলি জেলে নিয়ে আসা হয়, তখন জেল গেটে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। শুধু তাই নয়, যে তিন-চার মাস সময় তিনি ঐ জেলে ছিলেন সেই সময় হুগলি ঘাট স্টেশন প্ল্যাটফর্মে অনবরত জনতার ভিড় লেগে থাকত। কারণ ঐ স্টেশন প্ল্যাটফর্মটি বেশ উঁচু এবং সেখান থেকে নিচে হুগলি জেলের অভ্যন্তরভাগ স্পষ্ট দেখা যেত। দর্শনার্থী অসংখ্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে ঐ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকত। কখন কবি একটু বাইরে আসবেন, তাঁকে দেখবে। দর্শনার্থী জনগণকে নিবৃত্ত করার জন্য স্টেশন প্ল্যাটফর্মে উঁচু করে টিনের বেড়া দিয়ে দেওয়া হল।

হুগলি জেলে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবি করে এবং জেল সুপারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন করেন। জেলের বাইরে ঐ অনশনের সমর্থনে গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। যে সব যুবনেতা সেই আন্দোলন পরিচালনা করতেন, তাঁরা হলেন বিজয় মোদক, সিরাজুল হক, বীরেন ঘোষ, জনার্দন চক্রবর্তী প্রমুখ। বাইরের গণ আন্দোলন তাঁকে এতই প্রেরণা দিয়েছিল যে এই দু-তিন মাস সময়ের মধ্যে তিনি 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'শিকল পরা ছল মোদের এ', 'আজি রক্ত নিশি ভোরে', 'এস এস ওগো মরণ/এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ, প্রমুখ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন।

১৯২৩ সালের জুলাই মাসে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিয়ে, বহরমপুর জেলে স্থানান্তর করা হয়। এখানেও যুব সমাজ জেল-গেটে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। এখানে জেলের মধ্যে বাঘা যতীন প্রমুখ শহীদদের স্মরণে বালেশ্বর বলিদান স্মৃতি অনুষ্ঠান হয় এবং সেখানেও তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। এখান থেকেই কিছুদিন পরে তিনি

মুক্তিলাভ করেন এবং এই বছরেই তাঁর বিবাহ হয়।

নজরুলের বিবাহ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু নজরুলের মত কাজে ও কথায় নিষ্ঠার সাথে এরকম অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। তিনি কুমিল্লার শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর কন্যা কুমারী আশালতা সেনগুপ্তাকে বিবাহ করেন। ইনিই নজরুলের প্রিয়তমা পত্নী প্রমীলা নজরুল নামে পরিচিত। কেবলমাত্র বিবাহের মধ্য দিয়েই নয়, নজরুল তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আচার আচরণে অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চর্চা তিনি সমান নিষ্ঠার সাথে করেছেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় তির্যক ভঙ্গীতে বলেছেন ; ......হিন্দুরা কন্ পাত নেড়ে।"

এই সময় নজরুল হুগলিতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। প্রথমে মোগলপুরার গলিতে, পরে চক বাজারে। এখানে কল্লোল যুগের তরুণ কবিরা, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ প্রমুখ প্রায়ই আসতেন। আর আসতেন বিপ্লবী আব্দুল হালিম, নলিনী গুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি। এখানেই তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। তার নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। গোলাম মোস্তাফা একদিন তাঁর এই বাড়িতে এসেছিলেন, সেই উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন, "কাজী নজরুল ইসলাম/তাঁর বাড়ীতে একদিন গিসলাম/ভায়া গান গায় দিন-রাত/হেসে লাফ দেন তিন হাত।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাজী নজরুল একজন সুগায়ক এবং সুকণ্ঠ আবৃত্তিকার ছিলেন, অনেক সভায় তিনি গান গেয়ে আবৃত্তি করে আসর মাৎ করে দিয়েছেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর জন্মদিনে বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে তাঁর কণ্ঠ শোনানো হয় না, কি আকাশবাণীতে, কি অন্য কোথাও।

এই হুগলিতে থাকাকালীন সময়ে বাংলার চারণ কবি মুকুন্দদাস এসেছিলেন তাঁর কাছে। এই উপলক্ষ্যে সেখানে একটি যাত্রা-পালা অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল তাতে ধরা-চূড়া পরে 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' গানটি গেয়েছিলেন। এটি মুকুন্দদাস তাঁর 'পল্লীসেবা' পালার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী নৈহাটি ভাটপাড়ায় যুগান্তর দলের একটি শাখা সংগঠনের সূত্রপাত করেন। নাম তরুণ সংঘ। এরা সশস্ত্র সংগ্রামের মহড়া দিত। সেই সূত্রে নজরুল প্রায়ই নৈহাটিতে আসতেন। উঠতেন মিত্রপাড়া লেনে সুবোধ রায়ের বাড়ি অথবা মাদ্রালে কালিদাস ঘোষালের বাড়ি। এখানে একবার চন্দননগর বনাম নৈহাটি হাডুডু খেলার আসরে নজরুল নিজেই নেমে পড়েছিলেন। যুবকদের আহ্বান তিনি কখনই উপেক্ষা করতে পারতেন না। ১৯২৭ সালে বাঁকুড়া কলেজ এবং গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়। কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব সস্ত্রীক নজরুলের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। বাজেয়াপ্ত কাব্য গ্রন্থ 'বিষের বাঁশি' এবং 'ভাঙার গান, তাঁদের হাতে শোভা পেতে থাকে।

১৯২৬ সালের বেশির ভাগ সময় নজরুল কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করেছেন। এখানে তিনি বিপ্লবী হেমন্তকুমার সরকারের অতিথি হয়ে গোয়াল পট্টির মদন সরকার লেনে থাকতেন, পরে গ্রেস কটেজেও থেকেছেন। এই সময়ে একটি বছরের মধ্যে কৃষ্ণনগরে পর পর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিখিলবঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ধীবর সম্মেলনে উদ্বোধক ছিলেন নজরুল। তারপরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন। সভাপতি ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই সম্মেলন থেকেই দি ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস পার্টি অব বেঙ্গল এর সূত্রপাত হয়। নজরুল ছিলেন সেই সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ। তারপর এখানে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র ও যুবকদের প্রাদেশিক সম্মেলন, যার সভানেত্রী ছিলেন সরোজনী নাইডু। এখানেই নজরুল তাঁর 'ছাত্রদলের গান' লিখে শুনিয়েছিলেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভা। সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তখন সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই চলছে। সভার শুরুতে নজরুল তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' শোনালেন। তারপর সভাপতি তাঁর বক্তব্য রাখাতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হলেন। সভা পণ্ড হয়ে গেল মারামারি চেঁচামেচিতে। নজরুলই তখন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সভাস্থল থেকে বের করে নিয়ে আসেন, উত্তেজিত জনতার হাত থেকে রক্ষা করেন।

[ সূত্র : Indian Annual Register Jan--June 1926 P.8—12 ]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তার আগের বছর নজরুল দেশবন্ধুর সাথে ফরিদপুর গেছিলেন। এই সম্মেলনে 'হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট' নিয়ে আলোচনা হয়। নজরুল সেই উপলক্ষ্যে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 'বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে নব প্যাক্টের আসনাই/মুসলমানের হাতে ছুরি নাই, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।" হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে ফরিদপুরের হিন্দু মুসলিম তরুণ বিপ্লবী দল নজরুলকে পরে আরেকবার নিয়ে গেছিলেন ফরিদপুরে। তাঁকে নিয়ে অনেকগুলি সভা সমাবেশ করেছিলেন।

নজরুলের স্বগ্রাম চুরুলিয়ায় সম্প্রতি নজরুল একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। তাঁরা কিছু কিছু আর্থিক সাহায্যও পাচ্ছেন। কিন্তু নজরুল যেসব জায়গায় থেকে তাঁর কীর্তিস্তম্ভগুলি রচনা করে গেছেন যথা কলকাতার ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ি, ৩৭ নং হ্যারিসন রোড, ৭ নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন ও ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়ি, হুগলি বা কৃষ্ণনগরের বাসা—এইসব জায়গায় নজরুল স্মৃতিরক্ষা ও নজরুল সাহিত্য চর্চার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অথচ চুরুলিয়ার প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণই ছিল না। তাছাড়া আরেকটি কথা। নজরুল যুবসমাজের কাছে এত জনপ্রিয় ছিলেন জীবৎকালে, অসংখ্য স্কুল কলেজ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। অথচ এখন লক্ষ্য করা যায় যে অনেক স্কুল কলেজেই নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয় না।

নজরুল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন নি, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ করেছিলেন এক বছর, যখন পুনরায় ত্রিশের দশকে তিনি প্রচণ্ড অর্থকষ্টের সম্মুখীন হন। তাছাড়া তিনি গান শেখাতেন অনেককে, তার মধ্যে ঢাকার অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা উমা মৈত্র এবং চুচুঁড়ার রানু সোম, যিনি পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী সুলেখিকা প্রতিভা বসু হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। রানু সোমকে গান শেখাবার সময় একবার ভুল বুঝে কিছু সংখ্যক তরুণ যুবক তাঁকে রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে লাঠি-সোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুল তাদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পাল্টা মার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শৌর্য-বীর্য শুধু কলমেই প্রকাশ পায় না। পরবর্তীকালে সেই যুবকেরা তাঁর অনুগত ভক্তে পরিণত হয়।

নজরুলের জীবনে এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে, তা থেকে দেখা যাবে যে তিনি যুব সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শুধু

( শেষাংশ ১১১৬ পৃষ্ঠায় )

# তুষু উৎসবের উৎস-সন্ধানে

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং লোকসঙ্গীত সংকলনের পথ ধরে প্রাচীন মধ্য রাঢ় অঞ্চলের অতি জনপ্রিয় তুষু গান পণ্ডিত মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মানভূমের অংশ বিশেষ অর্থাৎ কংসাবতী নদী পুরোপুরি সমতল ভূমিতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত দু'কূলের জন-সমাজের সঙ্গে তুষু পরব অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কংসাবতী সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশের পরই, এমন কি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় তুষু গানের মেজাজ দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে বেশ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদের উত্তর দক্ষিণের গ্রামগুলিতে তুষু গান শুনতে পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নদ নদী থেকে দূরবর্তী কৃষি প্রধান গ্রামে তুষুর প্রভাব রয়েছে। এই সব এলাকার তুষু পরব বা গানের বিশ্লেষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না এগুলি তুষুর মূল কেন্দ্র থেকে উৎসারিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে নেমে এসেছে সংস্কৃতির চলমানতার পথ ধরে। কোথাও ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে এই সংস্কৃতি বিনিময়, কোথাও বা রুজি রোজগারের সন্ধানে এসে তুষুতোষিণীদের নতুন বসতি স্থাপনের মাধ্যমে। তারপর সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রতিবেশী গোষ্ঠীর চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে বিবর্তন।

যেমন, দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে পুরুলিয়া বাঁকুড়া জেলায় দেখেছি মেয়েরা ভাদু গান গায়, কিন্তু দামোদরের উত্তর অঞ্চলে বর্ধমান জেলার পুরুষরা জমায় ভাদু গানের আসর।

তুষুগান দীঘির জলের মত স্থির নয়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে কাঠামোগত বৈচিত্র্যের তারতম্য সত্ত্বেও এই গানের ব্যাপ্তির মধ্যে।

নদীর উৎস থেকে সঙ্গম পর্যন্ত নানা রূপ, নানা রূপান্তর; তবু নদীটি একই নামে পরিচিত থাকে।

তুষু গানও নদীর মত।

তুষু কোন বিশেষ পূজা নয়, ব্রতও নয়; নিছক সঙ্গীত নির্ভর পরব অর্থাৎ পর্ব। মনের আবেগকে প্রকাশ করে মকর সংক্রান্তিতে স্নানই তুষু পরবের প্রাণ কেন্দ্র।

তুষু পরবের মধ্য দিয়ে বৈদিক, লৌকিক বা পৌরাণিক কোন দেব বা দেবীর স্তুতি প্রকাশ পায় না; বরং সাধারণ মানব জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা দুঃখ হতাশার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশমাত্র।

তুষুর কোন বিধিবদ্ধ নাচ নেই। জাগরণের রাতে বিশেষ করে বিসর্জনে যাওয়ার পথে গানের ছন্দ ও সুরে এবং পথ চলার তালে আপন উদ্দাম ও উল্লাসে অঙ্গবিন্যাস করে মাত্র।

তুষুর কোন মন্ত্র নেই; লিখিত সঙ্গীত সংকলনের নির্ভরশীলতাও নয়। প্রতি বছর নতুন গান রচনা করে তুষু-তোষিণীরা; হয়ত বা মকর স্নানের সাথে সেই গানকে ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। অবগাহন অন্তে পুরাতনকে ধুয়ে মুছে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়। আর তাই মূর্ত হয় প্রতি বছর নতুন নতুন গানে সদ্য চলে যাওয়া বছরের হারাণ-প্রাপ্তির মানসিকতা।

তুষু পরবের এই বৈশিষ্ট্য ইংগিত করে নববর্ষের সূচনা।

অতীতে ঋগ্বেদের ঋষিগণ শীত ঋতু তথা উত্তরায়ণ আরম্ভ-দিন থেকে নববর্ষ গণনা করতেন। সাধারণ ভাবে আজও ঐ রীতিতে বর্ষ গণনা করা হয়।

পরবর্তী কালে শরৎ ঋতু থেকে বর্ষ গণনা প্রচলিত হয়।

বর্তমানে ২৪১ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ৩১৯ সালে ১লা বৈশাখ থেকে নববর্ষের প্রচলন হয়।

কিন্তু এই রীতিও ভারতের সর্বত্র প্রচলিত নয়।

তুষু সঙ্গীতের সহযোগী কোন বাদ্যযন্ত্র নেই; কিন্তু উপকরণ আছে।

মাটির সরায় নতুন ধানের তুষ। বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে বলে তুষখলা। এই তুষুখলায় সাতটি, দ্বিতল হলে চোদ্দটি প্রদীপ থাকে। প্রদীপের সংখ্যার হেরফেরও হয়। তবে অতীতের কথা যতদূর জানা যায় দ্বিতল তুষুখলায় দুই থাকে বৃত্তাকারে চোদ্দটি এবং সর্বোপরি একটি এই মোট পনেরটি প্রদীপ থাকত। এই পঞ্চদশ প্রদীপ চতুর্দশ তিথি ও পূর্ণিমার দ্যোতক বলে অনেকে মনে করেন।

তুষুখলার পঞ্চদশ প্রদীপের এই ব্যাখ্যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুক্তি নির্ভর করে দাবী করা যায় একদা চান্দ্র-পৌষ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি অন্তে পূর্ণিমায় তুষুর বিসর্জন হত। এই তিথিতে শুধু পৌষ সংক্রান্তি নয়; রবিরও মকর রাশিতে সংক্রমণ হত। দিনটি উত্তরায়ণ হিসাবে গণ্য ছিল। চন্দ্র সেই তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে।

রবির মকর সংক্রমণ তথা উত্তরায়ণের সঙ্গে কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠীর স্নানের একটি যোগ আছে।

সুদূর অতীতের মানুষ ... মকর ক্রান্তি উত্তরায়ণকে সঙ্গমে অবগাহন অন্তে নব কলেবরে নতুন বর্ষে আবির্ভাব হিসাবে ধরত এমত মনে করা অসংগত হবে না বলে মনে করি।

মহাকাশে মকররাশি ছায়াপথে আপ্লুত এবং এই ছায়াপথ বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র, সুরগঙ্গা ইত্যাদি নামে খ্যাত।

বাস্তবে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা যায় ভারতের অনেক দক্ষিণে মহাসাগরের উপর কল্পিত মকরক্রান্তি অবস্থিত।

পুরাতন বর্ষের বিদায় ও নববর্ষের আবির্ভাব এবং রবির মকরে প্রবেশ এই দু'য়ে মিলে কোন এক কালে স্নানের রীতির প্রচলন হওয়া স্বাভাবিক।

উত্তরায়ণাদিতে রবির মকর রাশিতে সংক্রমণ কালে পৌষ পূর্ণিমার চন্দ্রের অবস্থান পুষ্যা নক্ষত্রে।

পুষ্যা নক্ষত্রের বৈদিক তথা প্রাচীন নাম তিষ্য।

সুতরাং উত্তরায়ণাদি, রবির মকরে সংক্রমণ এবং পৌষ পূর্ণিমা ভিত্তিক পরবাদির নামকরণ তিষ্য নক্ষত্র অবলম্বনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তাই-ই হয়েছে মনে করি এবং কথ্য ভাষায় তিষ্য শব্দ বিকৃত হয়ে তুষু শব্দ এসেছে।

অথবা তিষ্য নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট কারণে পরবটি তুষু নামে খ্যাত হয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাশি নামের আবির্ভাব পরবর্তী কালের। তখন তুষু নামের পাশাপাশি মকর নামটিও প্রচলিত হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

অনেকে বলেন শব্দটি তুষু নয় টুসু; যদিও টুসু শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তির নির্ভরযোগ্য যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তি এবং উত্তরায়ণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নামের পরিচয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় পুরুলিয়া ও দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চল বাদে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ত এবং ষ এর প্রচলন বেশী। পুরুলিয়া ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় বলে টুসু।

ঐ অঞ্চলের উচ্চারণ ভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যায় দন্ত-স এবং ত এর স্থলে ট এর প্রাধান্য। রাঢ় অঞ্চলে এটা খুব বেশী।

সুতরাং তুষু এবং টুসু সমার্থক; উচ্চারণের পার্থক্যমাত্র।

বলা যায় উচ্চাবচ ভূখণ্ডের টুসু সমতলে উর্বরা মৃত্তিকায় এসে কোমল ধ্বনি আশ্রিত তুষু হয়েছে।

অতীতে কৃষিকাজে ছিল নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা। তাই তুষু পরব কৃষিজীবী সকল বয়সী মেয়েদের পরব।

বিগত বছরে ধান আহরণ করে চাল রেখে তুষ ভাসিয়ে দেয়। এই তুষ, ধানের খোসা আবার পূর্ণ হয়ে আসুক ঘরে নতুন বছরেও।

এই ভাবই মূর্ত হয়ে ওঠে তুষুর ভাসানে। কামনা নয়; যা পেয়েছি বিগত বছরে তারই বাস্তব প্রকাশ করে সঙ্গমে ডুব দিয়ে নববর্ষকে গ্রহণ তুষু পরব।

মকর সংক্রান্তির আগের দিন তুষু-তোষিণীরা সারারাত জেগে গান করে। এর নাম জাগ্রণ অর্থাৎ জাগরণ।

মনে হয় পূর্বরাত্রে জেগে থেকে নির্দিষ্ট মুহূর্তটি স্থির করা জাগরণের লক্ষ্য।

অতীতে যে অব্দে রাত্রিকালে পৌষ পূর্ণিমার প্রবৃত্তি ঘটেছিল; তার পরদিন সূর্যোদয়ে নববর্ষ-আরম্ভ হয়। তারই স্মৃতি জাগরণ। তুষুখলার পঞ্চদশ প্রদীপ এই কারণেই চতুর্দশী ও পূর্ণিমার ইংগিত বহন করছে।

রবির অয়ন স্থান-গতি বৎসর ৫০ (পঞ্চাশ) বিকলা হিসাবে (অথর্ব সংহিতা অনুসারে ৪৮ আটচল্লিশ বিকলা) পূর্ব হতে পশ্চিমে অর্থাৎ সূর্যের বিপরীতমুখী গতিতে সরে যাচ্ছে।

তুষু পরবে পৌষ পূর্ণিমায় রবির মকরে সংক্রমণ কালে উত্তরায়ণাদির ইংগিত আছে। অর্থাৎ বর্তমানের খ-মণ্ডল বিভাজনের অঙ্ক অনুসারে দু'শত সত্তর অংশে মকর রাশিতে রবির সংক্রমণ কালে উত্তরায়ণ হয়েছিল।

বর্তমানে উনিশ শত শকে মূলা নক্ষত্রে দু'শত ছেচল্লিশ অংশ বারো কলা সাইত্রিশ বিকলায় উত্তরায়ণাদি হচ্ছে।

সুতরাং অয়ন তেইশ অংশ সাতচল্লিশ কলা তেইশ বিকলা পিছিয়ে এসেছে প্রায় এক হাজার সাতশত তেরো বৎসরে।

এই হিসাবে বলা যায় প্রায় দু'শত সাতষট্টি খৃষ্টাব্দে (১৮৭ শকাব্দ) কংসাবতী নদীর দু'তীরে বসবাসকারী কৃষিজীবী মানব সমাজে তুষু পরবের উদ্ভব হয়েছিল।

আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর পূজা-পার্বণ বই এ বলছেন, যে বৎসর পুষ্যা নক্ষত্র-ভাগের আদিতে দক্ষিণায়ণ হইয়াছিল সে বৎসরই শকমুখ (৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

এই তথ্য অনুসারে তুষুর উদ্ভব অর্থাৎ পৌষ পূর্ণিমার রবি মকরে উত্তরায়ণাদি প্রায় দু'শত চল্লিশ শকাব্দে (৩১৮ খৃষ্টাব্দ)।

সুতরাং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষভাগ এবং চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগের কোনও এক সময়ে তুষু পরবের প্রচলন হয়েছিল।

আগে বলেছি তুষুখলার প্রদীপের সংখ্যার তারতম্য ঘটে।

সৌর মাস এবং চান্দ্রমাসের মধ্যে তিথির সংখ্যার পার্থক্যহেতু রবির মকরে সংক্রমণ তথা উত্তরায়ণ প্রতি বৎসর একই তিথিতে হয় না। মনে হয় তিথির পার্থক্য ইংগিত করার জন্যই তুষুখলায় প্রদীপ সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে প্রায় দু'হাজার বছর আগের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের জ্যোতির্বিদ্যা জানা ছিল কিনা।

মানুষ যেদিন সভ্যতার পথে পা বাড়িয়েছে, কৃষিকাজ অবলম্বন করে জনপদ প্রতিষ্ঠা করেছে সেদিন থেকেই সে আকাশের নক্ষত্রকে চিনতে শিখেছে। রাতের আকাশে তারা চিনতে হয়; পূর্ণচন্দ্র দেখে আগামী অমাবস্যার হিসাব গণনা সহজ। পূর্ণিমার

সূত্র ধরে মাসকে জানা, ঋতুর আবর্তন শেখা। ঋতুচক্রের আনাগোনার সঙ্গে পরিচয় না হলে কৃষিকাজ হয় না। তাই অতীতের মানুষ আপন তাগিদেই আকাশতত্ত্ব আয়ত্ত করেছে; শিক্ষিত মানুষের পঞ্জিকার অপেক্ষা না রেখেই।

আজও বনচর মানুষ তাদের উৎসব অনুষ্ঠান করে আকাশের নক্ষত্র অনুসরণ করে; পূর্ণিমা অমাবস্যার হিসাবে মেনে। তারা অনুষ্ঠান করে তাদের আকাশ তত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে আমরা শিক্ষিতরা সেই দিনক্ষণটি তিথিনক্ষত্র মুহূর্ত দিয়ে বেঁধে প্রকাশ করি মাত্র।

প্রায় সকল লোকসঙ্গীত ও অনুষ্ঠান একান্ত ভাবে জীবিকা ভিত্তিক। তুষু কৃষিভিত্তিক পরব।

সারা বছরের মেহনতের ফসল ঘরে তোলা, অতীতের স্মৃতি বর্ষ বিদায় ও বর্ষ আরম্ভ এই দু'য়ে মিলে তুষু পরব।

তুষুর উদ্ভব কংসাবতীর কূলে এবং প্রায় দু'হাজার বছর আগে। সেকালে কেমন ছিল কংসাবতী উপত্যকার ভূ-প্রকৃতি? কতটুকু অস্তিত্ব ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার বর্তমান উর্বর পাললিক ভূ-খণ্ডের? তাত্ত্বিক তর্কের প্রয়োজন নেই; সহজ ভাবেই বলা যায়, পুরুলিয়া দক্ষিণ বাঁকুড়ার কংসাবতী উপত্যকার সেকালে এমন দৈন্যদশা ও রুক্ষতা ছিল না। কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ জনপদ সেখানে ছিল বলেই আজও ঐ অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রসারের সাক্ষর পুরাকীর্তির সন্ধান পাই। রুক্ষদৈন্য এলাকার বন্য অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে জৈনরা ধর্ম প্রচার ও মন্দির স্থাপন করেছিল এ চিন্তা বাতুলতার লক্ষণ।

প্রয়োজনের তাগিদে বন নষ্ট হয়েছে, ফলে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটেছে। বর্ষণে ভূমিক্ষয় হয়ে ভিতরের পাথুরে কঙ্কাল আত্মপ্রকাশ করেছে। উর্বর জমি অনাবাদী পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে, ঐ অঞ্চলের উত্তর-পূর্বদিকে পলিজমে নতুন ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। নদী সরে গিয়েছে, গতি বদল করেছে উচ্চাবচ এলাকার কৃষিজীবী মানুষ অন্নসংস্থানের তাগিদে নতুন বসতি স্থাপন করেছে নতুন চরে। মানুষের এই চলমানতা আদিম কাল থেকেই রয়েছে। সুতরাং তুষু উৎসবের মূল ভূ-খণ্ডের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুষু পরবের বিচার করলে ভুল হয়।

তুষু এখানেকার সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে; বর্তমানের রুক্ষ অনুদার মৃত্তিকা আর শস্যসম্পদের স্বল্পতা তুষু পরবকে এতটুকু ম্লান করেনি।

লক্ষাধিক কৃষিকজুর ইদানীংকালে ঐসব এলাকা থেকে হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় রুজি রোজগারের কারণে ধানচাষে দিনমজুরী খাটতে আসে। যারা এদের আনে তারা জানে মকরে এরা কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে না চায়; তাতে মজুরী কাটা যায় যাক্।

তুষু তথা মকর এই অঞ্চলের গণ উৎসব। এসময় ঘরে থাকতে হবেই, ঘরে ফিরতে হবেই।

মকরের আগের রাতে যানবাহনের অভাবে দলবদ্ধ খেটে খাওয়া মানুষ মাইলের পর মাইল শীত উপেক্ষা করে হেঁটে চলেছে ঘরের পথে। প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছে; কাল যে মকর, কাল যে পরব। যে পরব এমনভাবে প্রবাসী মানুষকে ঘরে টানে, যে পরব একান্তভাবে সঙ্গীত আশ্রিত, সেই তুষু পরবের সঙ্গীত-সম্পদের সম্ভাব্য চলমানতা ব্যাহত হয়েছে একথা মেনে নেওয়া শক্ত।

যেখানে কংসাবতী নদী বড় বড় পাথরে মাথা ঠুকে দহ সৃষ্টি করে কোন রকমে পথ করে বয়ে চলেছে সেই পোরকুলের বিখ্যাত তুষু মেলা দেখেছি। দেখেছি রাণী বাঁধ থানার কুমারী কংসাবতী নদীর সঙ্গমে তুষু মেলা।

দেখে এটুকুই বুঝেছি তুষু পরবের চরিত্র বদল ঘটছে কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আজ তুষু মূর্তির প্রচলন হয়েছে; সাধারণ নারী মূর্তি। ময়ূরবাহনা অথবা অশ্ববাহনা তুষুমূর্তিও দেখা যায়। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষের দলও ইদানীং গেয়ে নেচে তুষু ভাসাতে আসে। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ভূমিকা পেয়েছে। আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র থেকে শুরু করে খোল করতাল হারমনিয়ম ঢোল গানের সঙ্গে সঙ্গত করছে। নাচে নিছক ভাবপ্রকাশের অঙ্গবিন্যাস নয়; বর্তমান কালে সহরে প্রতিমা বিসর্জন কালে যে নাচের বহর তারই দোলা লেগেছে তুষু ভাসানে।

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের আদলে অথবা রেখদেউলের অনুকরণে আবির্ভাব হয়েছে তুষুর ভেলা বা চৌদল অর্থাৎ চতুর্দোলা। রঙ্গীন কাগজ, শোলা ও বাঁশকাঠি দিয়ে এই চৌদল বা ভেলা তৈরী হয়।

তুষু গানের সুর প্রায় অবিকৃত থাকলেও কথায় আধুনিক শব্দ ও বস্তুর প্রাধান্য এবং ভাবে কৃত্রিমতা এসেছে।

তুষু গানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই পরব প্রাচীন কাল থেকে অনুষ্ঠিত হলেও শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় মনোবিকৃতির কোন স্থান নেই। এমন কি ইদানীং পুরুষরা ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও অসুস্থ চিন্তার প্রবেশ ঘটে নি।

তুষু পরবের এই বিবর্তনের সূত্র ধরে দাবী করা যায় তুষু গানের চলমানতা এতটুকু স্তব্ধ হয় নি। বরং প্রাণ স্পন্দন তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জীবন ধারণের পদ্ধতি থেকে মানুষের

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রকাশ জন্ম দেয় সেই অঞ্চলের লোক সঙ্গীতের।

কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিন্তাদর্শও লোক সঙ্গীতের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যেমন প্রভাব পড়ে কালের ও সমাজ বিবর্তনের। সুতরাং অঞ্চল-ভিত্তিক অনুষ্ঠান, ব্রত ও পরবের নিজস্ব একটা গণ্ডী থাকে। কোন কোন লৌকিক অনুষ্ঠান বা সঙ্গীত বিশেষ মানবগোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গণ্ডীবদ্ধ এই অনুষ্ঠানাদি নিজস্ব গোষ্ঠী বা অঞ্চলের মধ্যে সীমারিত হলেও ঐ সব উৎসবাদি আশ্রিত সঙ্গীতের বহমানতা ক্ষুন্ন হয় না। এর প্রমাণ তুষু পরবের বিবর্তন।

তুষু প্রভাবতি উপত্যকার আদিম আদিবাসী হিসাবে ভূমিজ সম্প্রদায়কে ধরা যায়। কোন কোন গবেষক এদের মুণ্ডা জাতির একটি শাখা মনে করেন এবং তাদের আদিমতম নিবাস ছিল রাঁচী জেলায়।

ঐতিহাসিক কাল থেকে এ অঞ্চলে ভূমিজ ছাড়া মাহাতো উপাধিধারী কুর্মি ক্ষত্রিয়, আদিবাসী সাঁওতাল, তফসিলী সম্প্রদায় এবং উৎকল সম্প্রদায়ের ঘন জনবসতি স্থাপিত হয়।

ভূমিজ এবং কুর্মি ক্ষত্রিয়রা মূলতঃ কৃষিজীবী। এই গোষ্ঠীর মেয়েদের মধ্যে তুষুর বেশী প্রাধান্য।

তুষু উৎসবের উৎসে পৌঁছুতে এই দুই গোষ্ঠীর আচরিত জাওয়া পরব, করম এবং ইঁদ পরব বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে করম পূজা হয়।

এর ঠিক পনের দিন আগে অর্থাৎ অমা-দ্বাদশী তিথিতে জাওয়া পরব।

করম পূজার পরদিন ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ইঁদ পরব। তুষু পরব পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ পূর্ণিমায় উত্তরায়ণে

পরিশেষে, তুষু গানের মধ্যে তোষলী নামে একটি স্থানের উল্লেখ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ আছে।

তুষু প্রভাবিত অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ফলে উড়িষ্যা তথা প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রভাব এ অঞ্চলে পড়া স্বাভাবিক। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় উৎকল সম্প্রদায়ের ঘনবসতি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মৌর্য শাসনকালে কলিঙ্গ দেশে তোষলী নামে একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল।

বর্তমান ভারতের মানচিত্রে এখনও তোষলী কোথায় ছিল কেউ নির্দ্দেশ করতে পারেন নি।

তুষু গানে তোষলী জনপদের উল্লেখ অনুসরণে বলা যাবে কি যে অঞ্চল তুষু পরবের এত প্রাধান্য তাকেই তোষলী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে ছিল মৌর্য আমলে? মহাবীর জৈনের ধর্মপ্রচার কালের রাঢ় ভূমির অংশ বিশেষ মৌর্য আমলে তোষলী নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নয়। স্থান নামের এমন পরিবর্তন কালক্রমে ঘটে থাকে। ভাবতে হবে তোষলীর কৃষিজীবী পরিবারের মেয়েরা যে পরবের অনুষ্ঠান করত তাই তুষু নামে পরিচিত হয়েছে কিনা

তুষুগানে আরও একটি স্থান নাম পাওয়া যায়, যার নাম পোখন্না।

পণ্ডিতরা বলেন বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল পুষ্করণে অর্থাৎ বাকুড়া জেলার উত্তর-পূর্ব দিকে দামোদর তীরে পোখন্না গ্রামে। লিপিটি চতুর্থ শতকের। ঐ লিপির সঙ্গে তুষুখলার মত পঞ্চদশ প্রদীপ উৎকীর্ণ রয়েছে।

শুশুনিয়া থেকে দক্ষিণে রাণীবাঁধ থানার অম্বিকানগর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে একই ধরণের বীরস্তম্ভ অনুসরণ করে মনে হয় জেলার দক্ষিণে উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে একদা এই অঞ্চলে কোন রাজা রাজ্যবিস্তার করেছিল।

উড়িষ্যার ইতিহাসে চতুর্থ শতাব্দীর সমকালে বর্মণ রাজবংশ রাজত্ব করেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তর উড়িষ্যায় প্রাচীন কালে লে পোস্করণ নামে একটি বিষয় ভূক্তি ছিল।

চিন্তা করতে হবে শুশুনিয়ার শিলালিপির সঙ্গে উপরোক্ত তথ্যগুলিরসম্পর্ক আছে কিনা এবং লিপির পঞ্চদশ প্রদীপের সঙ্গে তুষুখলার প্রদীপ সংখ্যা একই তথ্য ইংগিত করছে কিনা।

এই প্রশ্নের তথ্যগত সমর্থনযোগ্য উত্তর পাওয়া গেলে তুষু উৎসবের উৎস সম্পর্কে কোনদিন দ্বিমত দেখা দেবে না বলে মনে করি।

# সংস্কৃতি সংবাদ

## মালদহ মিউজিয়াম ঃ গৌড়বঙ্গের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতীক

মালদহ শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য মালদহ মিউজিয়াম। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে এই মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে সেই সব জিনিস নিয়েই মালদহ মিউজিয়াম গড়ে উঠেছিল। মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাঁরা বিশেষভাবে উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী বি. আর. সেন অন্যতম। তিনি ছিলেন এই জেলার জেলাশাসক। তাঁরই নামানুসারে এই মিউজিয়ামের নামকরণ হয়েছিল বি. আর. সেন মিউজিয়াম। পরবর্তীকালে এই মিউজিয়ামের নাম হয় মালদহ মিউজিয়াম।

প্রতিদিন এই মিউজিয়াম দেখতে বহু দর্শকের সমাগম হয়। শহরের একটি বিশিষ্ট সড়কের ওপর অবস্থিত এই পাকা বাড়িটির প্রশস্ত কক্ষের চারিদিকে পাথরের মূর্তি সাজানো। প্রতিটি মূর্তির শৈল্পিক নৈপুণ্য সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এখানে বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাই বেশি। সূর্যদেবের মূর্তির সংখ্যাও খুব কম নয়। এছাড়া গনেশ, ব্রহ্মা, মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা, কার্তিক বুদ্ধ এমনকি প্রজ্ঞা পারমিতার মূর্তি পর্যন্ত সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হয়েছে মালদহ মিউজিয়ামে। মূর্তিগুলির অধিকাংশই মালদহের পাজল, বামনগোলা ও হবিবপুর থেকে সংগৃহীত। ঘুরে ঘুরে মূর্তিগুলি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। মূর্তিগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি।

শুনলাম মালদহ মিউজিয়ামে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাও আছে। আর আছে আরবী ভাষার লেখা প্রস্তর ফলক।

মালদহ মিউজিয়াম দেখার পর মালদহের অতীত সম্পর্কে দর্শকের ধারণা স্পষ্ট হয়। বেশ বোঝা যায়, প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন খুবই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। নাগরিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল এবং তারা যথেষ্ট বিদগ্ধ ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মমত প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে এখানে।

এখানকার বুদ্ধমূর্তি এবং প্রজ্ঞাপারমিতার প্রস্তর মূর্তি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে একসময় বুদ্ধধর্ম এখানে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। পাল রাজাদের রাজত্বকালেও মালদহ উপেক্ষিত ছিল না। বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন এই মালদহকে।

সেন রাজাদের আমলে এই অঞ্চলের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং এটি ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-ধর্মের প্রচার ক্ষেত্রের রূপ নেয়। দিক্‌বিদিকে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুর সুদর্শন প্রস্তরমূর্তি পূজিত হয়। স্থপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও চরম উৎকর্ষ ঘটে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীদের পূজা রাঢ় অঞ্চল থেকে এ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। সর্পদেবী মনসা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গাপূজাও এ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর কোন মূর্তি মালদহ মিউজিয়ামে দেখা যায় না। তবে চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার এই অঞ্চলে ঘটেছিল। মালদহ সহরের অনতিদূরে রামকেলীতে সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আজো পূজিত হয়। রামকেলীতে চৈতন্যদেবের শুভাগমন স্পর্শ করে এখনও প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি তিথিতে মেলা বসে। গৌড়বঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেম-ধর্মের প্রাধান্য এখনও অনস্বীকার্য। গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাবের পাশাপাশি শাক্ত প্রভাবও বর্তমান। মালদহ জেলার বিভিন্ন স্থানে মা-কালী বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। মালদহ জেলার মা জহরা খুবই জাগ্রত কালী হিসাবে গণ্য হয়ে থাকেন।

পীর-পয়গম্বরদের প্রভাবও মালদহ জেলায় যথেষ্ট। এ অঞ্চলের অনেকেই পীরের দরগায় মাটির ঘোড়া মানত করে। সিন্নি ভোগ দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক উত্থান ও পতনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সংস্কৃতির এক সমন্বিত রূপ গৌড়বঙ্গে এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়।

হরিপদ সাহা

## মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক ও নিম্ন বনিয়াদী বিদ্যালয়সমূহের দ্বিতীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা—১৯৮১

গত ৭ এপ্রিল, ১৯৮১ বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের এক বর্ণাঢ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার শুরুতে মশাল পরিক্রমা, প্রতিযোগীদের পতাকা ও ফেস্টুনসহ মাঠ পরিক্রমা হয়। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রী এ. বি. ভোরা।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা শাসক শ্রীমতী কস্তুরী গুপ্ত মেনন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি।

প্রতিযোগীদের শপথ গ্রহণের পর ক্রীড়ানুষ্ঠান শুরু হয়। ১৮টি দফায় শতাধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অগণিত জনসমাগম হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল আর মনে হচ্ছিল যেন একটি মিনি অলিম্পিক।

স্বাগত ভাষণে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য বলেন গত বছর গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র ছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করেছিল। এবার শহরের ছাত্রছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। এটা একটা বিরাট আয়োজন। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারি অর্থানুকূল্যে। অতীতে কখনো এরকম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। শ্রীভট্টাচার্য আরো বলেন বামফ্রন্ট সরকারও প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই সার্বজনীন করতে এবং শিক্ষাকে অর্থবহ করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নতুন প্রবর্তিত প্রাথমিক পাঠক্রমে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অভ্যাস ও অনুশীলনের ব্যবস্থা হলে তবেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন সার্থক হবে।

শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারি মুর্শিদাবাদ জেলা পর্ষদের এই বিরাট উদ্যোগ ও প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে বলেন খেলাধূলা শিশু মনের ও দেহের বিকাশ সাধনের সহায়তা করে। তিনি আরো বলেন বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ভিতর নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তন ঘটান হয়েছে। ছোট ছেলে মেয়েরা ছবি আঁকবে, খেলাধূলা করবে, এই ভাবে ধাপে ধাপে এগুবে, পরীক্ষার যে একটা ভীতি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে থাকে তা দূর করার চেষ্টা চলেছে। পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য নেমে এসেছিল তার অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার মুষ্টিমেয় লোককে উচ্চ শিক্ষিত করার পরিবর্তে দেশের অধিকাংশ লোককে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য-কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

( শেষাংশ ১১১০ পৃষ্ঠায় )

# ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায়

সমীর রায় চৌধুরী

## একটি সাক্ষাৎকার

১২এ, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুরের এই বাড়িটি হয়তো কলিকাতা পৌরসভার আরো পাঁচটি বাড়ির মতই বৈচিত্র্যহীন কিন্তু এদেশের শিল্পরসিকজনের কাছে ঐ বাড়িটি একটি নূতন মাত্রা আরোপিত করে দেখছে। দেশ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না ভাস্কর শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়ের শিল্পসাধনাধন্য এই ছোট্ট পুরোনো বাসগৃহটিতে গিয়ে হাজির হলাম সাক্ষাৎলাভের আশায়। নিছক সাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। এ বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ শিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য প্রতি বছর একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে অবনীন্দ্র পুরস্কার-দানে সম্মানিত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায় ১৯৮১ সালের নির্বাচিতা সেই শিল্পী আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়কে সেই পুরস্কার প্রদানের সংবাদ জ্ঞাপন করা এবং তাঁকে পুরস্কার দান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোও এই সঙ্গে অপর উদ্দেশ্য হিসাবে ছিল।

দোতলার উপর ছোট্ট ঘর দুখানিতে চিত্র ও ভাস্কর্যের নানা নিদর্শন ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। নিছক অযত্নেও নয়, আবার তাদের অবস্থিতির মধ্যে সযতন হস্তলেপনের কোন লক্ষণও তেমন স্পষ্ট নয়। সেদিন আবার ঐ সব কলাবস্তু এবং চেয়ার টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে বসে গেছে চলচ্চিত্র ক্যামেরার যন্ত্রপাতি আর আলোর মেলা। কলাকুশলীরা জানালেন—শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প ও সাধনার উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে, এ তারই আয়োজন।

মনটা একমুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। শিল্পীর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে দুটি লক্ষণীয় স্বীকৃতি এমন পরস্পর অপ্রত্যাশিতভাবে একই স্থানে উপস্থিত হয়েছে—এ-ও যেন এক আশ্চর্য বা দৈব যোগাযোগ।

বাড়িতে প্রবেশের মুখেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। দুপুরের ঐ অপার্থিব সময়টাতে নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাতে যেন শিল্পীকে কিছুটা বিভ্রান্ত ও বিব্রত মনে হলো। তবু উপযুক্ত আপ্যায়ন জানিয়ে জিনিষপত্রের মাঝখানেই একটু স্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বারবার তাঁর স্বাভাবসুলভ কোমল ও আন্তরিক ভাষায় ক্ষমাপ্রার্থনা করছিলেন আমাদের জন্য উপযুক্ত আপ্যায়ন করতে না পারার দীনতা স্বীকার করে।

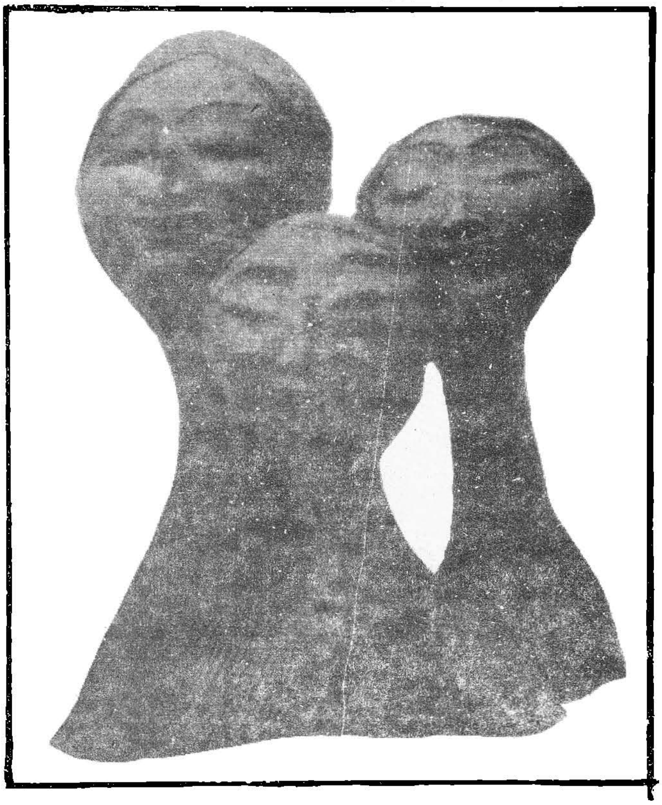
বললাম—"আপনি কেন এত বিব্রত বোধ করছেন? বরং এমন সময়ে হাজির হয়ে আমারই নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।" শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় হাসলেন। তাঁর অসাধারণ নম্রতা ও বিনতি ভাব মুখমণ্ডলে আবার ফুটে উঠলো সেই বুদ্ধিদীপ্ত, প্রশান্ত, স্মিত হাস্যের উজ্জ্বল প্রকাশ। বললাম—"বেশীক্ষণ কিন্তু সময় নষ্ট করবো না আপনার। দুচারটি মাত্র প্রশ্ন আছে; জবাব নিয়ে ফিরবো। আচ্ছা, সরকারের দেওরা এই পুরস্কারের ঘোষণা শুনে আপনার প্রথমেই কি রকম মনে হলো?"

হাসলেন শ্রীমতী মীরা। বললেন—"তার আগে বলুন, আপনারা আমায় নির্বাচন করার সময়ে কি মনে করেছিলেন? আপনাদের রিএ্যাকশনটা শুনি?"

বললাম—"আমাদের রিএ্যাকশনের ফলশ্রুতিই তো এই পুরস্কার। সুতরাং নতুন কোনো বক্তব্যের তো আর অপেক্ষা রাখে না। আপনার অনুভূতির খবরটাই জানতে চাইছি।"

—"আপনারা যদি আমায় পুরস্কার দিয়ে খুশী হয়ে থাকেন তবে আমিও তাতে খুশী। তাছাড়া সরকারী পুরস্কার বা দেশের স্বীকৃতি তো নিঃসন্দেহে শিল্পীর জীবনে এক অসাধারণ কাম্যবস্তু। এতে বিচলিত হবেন না এমন মানুষ কি কোথাও আছেন?"

—"আচ্ছা বিদেশে শিক্ষালাভ করেছেন, বিদেশে আপনার শিল্পকলা বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত



ও সংঘটিত হয়েছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি দেশবাসীর কাছে এমন করে নিজেকে সংগুপ্ত রেখেছেন কেন? জানেন, অনেকে তো এ খবর শুনে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে আপনার পরিচয় আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন। কেন আপনি সাধারণের কাছাকাছি আসছেন না?"

হাসলেন শ্রীমতী মীরা। আবার সেই আত্মমগ্নতা। বললেন—"আসলে কি জানেন, আমি প্রচারে ভীষণ ভয় পাই। মনের ভিতর সৃষ্টির একটা প্রচণ্ড তাগিদে কাজ করে যাই। প্রদর্শনীতে ছবি বা ভাস্কর্য দেখাই। বিক্রি হলো কি হলো না তা নিয়েও ভাবি না। হয়তো বলবেন, হাজার হাজার টাকা খরচ করে যে ধাতুমূর্তি আমি তৈরী করি—তা বিক্রি না হলে খরচা ওঠে কোথেকে অথবা আমার চলেই বা কি করে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ভাববার কথা। কিছু বিক্রি হয়। তার দাম থেকে আমার প্রয়োজনীয় খরচ করে বাকিটা ব্যবহার করি আমার নতুন শিল্পকর্ম গড়তে। প্রচুর টাকার ব্যাপার। কিন্তু ব্যবস্থাও তো দেখি হয়ে যায়।"

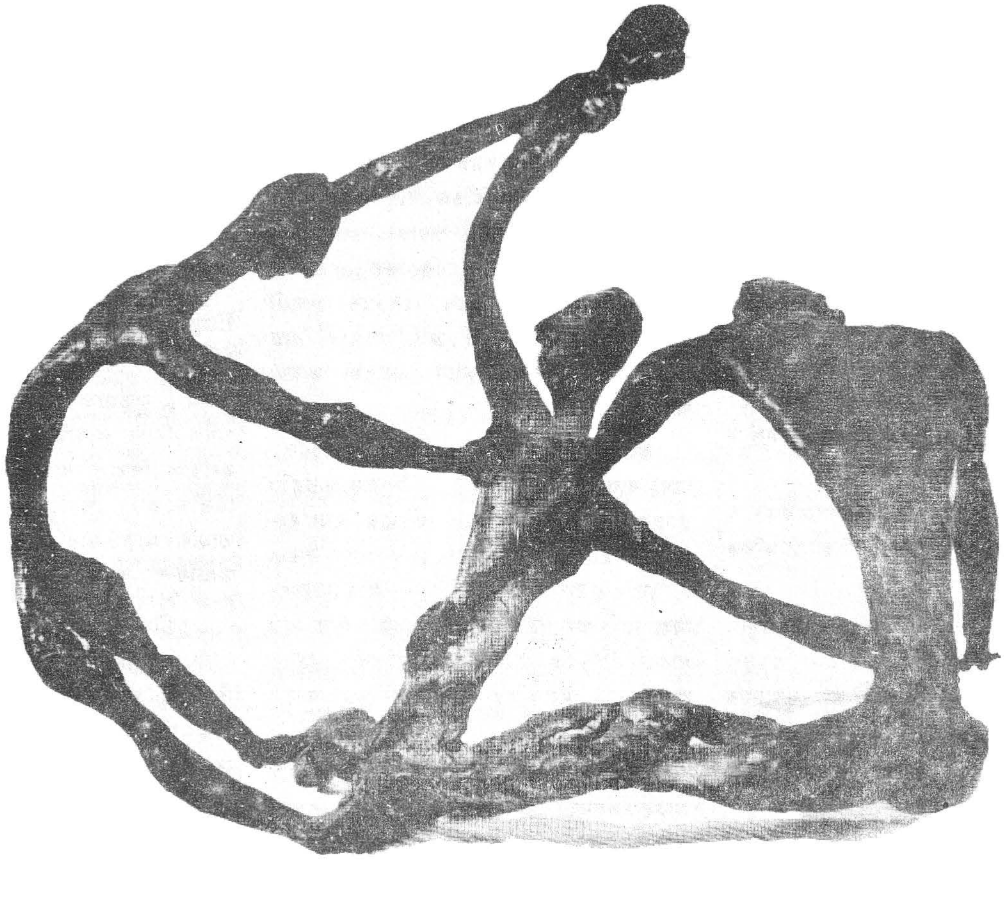
প্রশ্ন করলাম—"বিদেশে শিক্ষালাভ করলেও পাশ্চাত্যের দুর্বোধ্য বিমূর্ত ভাস্কর্যকলার আঙ্গিক আপনার কাজে ছায়াপাত ঘটায়নি কি করে?"

—"আমার ভাবপ্রকাশের ব্যাপারে আমার নিজস্ব কতকগুলো ধারণাই আমার আঙ্গিক হিসাবে এসে গেছে। তাই ধার করা আঙ্গিকের পুনরুক্তির প্রয়োজন হয়নি।"

সর্বশেষ প্রশ্ন করলাম—"ছোট্ট একটা কৌতূহলী প্রশ্ন রাখছি, পুরস্কারের অর্থমূল্য তেমন তেমন বৃহৎ কিছু নয়, তবু এটা কি তাৎক্ষণিক হয়েও কোনোভাবে আপনার শিল্পকর্মে সহায়তা করলো বলে আপনার মনে হচ্ছে?"

এবার ওঁরও হাসবার পালা। হাসতে হাসতেই বললেন—"পুজোর পর কিছু নতুন ঢালাইয়ের কাজ করবো। অনেক টাকার ব্যাপার। তখন ও টাকাটা বেশ কাজে লাগবে।"

নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম। পরিচ্ছদে, আচরণে, ব্যক্তিত্বে, প্রকাশভঙ্গিতে অসাধারণ এই শিল্পীর কাছে তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ জানাতে গিয়ে নিজেই যে পুরস্কার লাভ করে ফিরলাম তা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় এক অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইল। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবারে সারাদিন ধরে তাঁর ঐ বাড়ীতে তিনি বসান ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আসর। রসিক দর্শক যে কোনো একদিন গিয়ে পরিচিত হয়ে আসুন না শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্যের সঙ্গে? ব্যক্তিত্বে ও শিল্পকলায় শ্রীমতী মীরা নিঃসন্দেহে সেই দর্শককে এমন কিছু দেবেনই—যা তাঁর কাছে হয়ে থাকবে আমারই মত লাভ করা এক বিরল অভিজ্ঞতা।



# প্রাথমিক স্তরে ভাষা সম্পর্কে ভারতীয় কমিশন ও কমিটিগুলির সুপারিশ

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ২৩ ও ২৪ জানুয়ারী (১৯৫৩) রাজধানী নয়াদিল্লীতে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইংরেজি অধ্যাপকদের ইংরেজি পঠন-পাঠন সম্পর্কে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের সুপারিশ 'মুদালিয়র কমিশনে'র প্রতিবেদনে প্রকাশিত ও গৃহীত হয়েছিল। তার একাংশে বলা হয়ঃ

মাধ্যমিক স্তর থেকেই ছ'বছর ইংরেজি আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে থাকবে তবে এই শিক্ষাকাল পাঁচ বছরেও কমিয়ে আনা যায় যদি উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে সপ্তাহে ৫০ মিনিট ব্যাপী ছ'টি ক্লাস ইংরেজির জন্য নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

মন্তব্যঃ এই সুপারিশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি পাঠ আরম্ভের যুক্তিযুক্ততা মেনে নেওয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে মূল সুপারিশের সংক্ষিপ্তসারে বলা হচ্ছেঃ

মিডল স্কুল স্তর থেকেই (৫ম—৮ম শ্রেণী) দুটি ভাষা শেখানো উচিত। ইংরেজী ও হিন্দী ভাষা নিম্ন বুনিয়াদী স্তরের (১ম—৪র্থ শ্রেণী) পরে শেখানো সুরু হওয়া দরকার। তবে দুটি ভাষা একই শ্রেণী থেকে শেখানো সুরু করা উচিত নয়।

ভারত সরকার, সরকারী ভাষা কমিশনের-রিপোর্ট (১৯৫৭) চেয়ারম্যান বি. জি. খের বলেন,

ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুসারে বলা চলে যে, এদেশে সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাতেই হবে—ইংরেজী ভাষাতে নয়।

এদেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে লক্ষণীয় যে নিয়মানুগভাবে এই ভাষার শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকে দেওয়া চলে না।

যে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে ইংরেজি শেখানের দরকার হয় তার জন্য যতটুকু ইংরেজি জ্ঞান দরকার বিদ্যালয়ে তা শেখানোর জন্য পূর্বের চেয়ে আরো সময় সংক্ষেপ করা যায়। মাধ্যমিক স্তরের শেষ দিক থেকে ইংরেজি শেখানো শুরু হোক।

বিদ্যালয়ে পাঠক্রম কী হবে তা শিক্ষাবিদেরা ঠিক করুন, তবে আমাদের সুপারিশ এই যে, পূর্ববর্ণিত উদ্দেশ্যের জন্য ইংরেজি ভাষা শেখানোর কারণে মাধ্যমিকস্তরে কেবল পাঁচ বছর পড়ালেই যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকপর্যায়ের শিক্ষায় যতটুকু ইংরেজি ভাষা জ্ঞান দরকার তার জন্য আমাদের মতে বিদ্যালয়ে শেষের পাঁচ বছরই যথেষ্ট, অর্থাৎ ছাত্রের বারো বছর বয়স থেকেই ইংরেজি শেখা শুরু হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারা অনুযায়ী নিঃশুল্ক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষাদান অপচয় ছাড়া কিছু নয়। প্রাথমিক স্তরের এই স্বল্পসময়ে ইংরেজি শেখার চেষ্টায় শিশু-শিক্ষার্থীর কোনো স্থায়ী লাভ ঘটে না, পরন্তু এর ফলে সময়াভাবে শিক্ষার্থীর নিজের মাতৃভাষা বা অন্য বিষয় শেখায় বাধা পড়ে।

যাঁরা ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্ঞান-সম্পদের অত্যাবশ্যক যোগাযোগ কল্পনা করে থাকেন তাঁদের ধারণা ভ্রমাত্মক—তাঁরা বাহনের সঙ্গে বিষয়কে একীভূত করে দেখছেন। ঐতিহাসিক সূত্রে পশ্চিমের জ্ঞান ইংরেজির বাহনে চড়ে এদেশে এসেছে কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র এই বাহনে চড়ে ঐ জ্ঞান সর্বত্রগামী হয়নি—যেমন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে নিছক রাজনৈতিক সংযোগের দরুণ ফরাসী ওলন্দাজ ও স্পেনীয় ভাষায় ঐ জ্ঞান বিতরিত হয়েছে—জাপানের কথাই ধরা যাক, সেদেশে জাপানী ভাষার মাধ্যমেই পশ্চিমী জ্ঞান বিস্তার লাভ করেছে—এ ব্যাপারে কোনো বিদেশী ভাষার বাহন ব্যবহৃত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণা ক্রমশ প্রচারিত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষায় ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ব্যবহারের ব্যবস্থায় এবং ইংরেজিকে এদেশে তার যথাযথ স্থানে স্থাপন করার চেষ্টায় এটা মনে করা ভুল হবে যে বিশ্ব-বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে চাই, কিংবা বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ হারাবার জন্যই ইংরেজির এই অবস্থান্তর আমরা ঘটাতে চাইছি।

রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকার মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে ত্রিভাষা সূত্র প্রবর্তন করেছেন। এই সূত্র অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভাষা বিষয়গুলি মাধ্যমিক স্তরেই কেবল পঠনীয় বলে স্বীকৃত হয়েছেঃ

ক) স্থানীয় ভাষা ও মাতৃভাষা—যেখানে টি ভাষা এক নয়,

খ) হিন্দী কিংবা হিন্দীভাষী এলাকায় অপর একটি ভারতীয় ভাষা,

গ) ইংরেজি কিংবা যে কোনো একটি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক, ইমোশনাল ইনট্রিগেশন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান সম্পূর্ণানন্দের মতে—

আমরা সুপারিশ করি, বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একমাত্র আবশ্যকীয় ভাষা হবে মাতৃভাষা, নয়তো কোনো স্থানীয় ভাষা। শিক্ষার এই স্তরে ভাষাশিক্ষা শিক্ষার্থীদের যে কাজে লাগবে তা হলঃ

১. তাদের কথোপকথনের ক্ষমতা এবং সহজে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতার বিকাশ,

২. নির্ভুল বই পড়া ও লেখার শিক্ষা,

৩. বয়সোপযোগী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো।

ভারতের সাধারণ মানুষ, শিল্পী কারিগর ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান যদি বিতরিত না হয় এবং এ জাতীয় অবিরাম যোগাযোগ না ঘটে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে। এই কাউন্সিল মনে করে দেশের মধ্যে যে সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে তা সুপ্তই থাকবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভারতীয় ভাষায় না হয়।

Government of India, Report of the study group on the study of English appointed by the Ministry of Education, 1964.-এর চেয়ারম্যান বলেনঃ মাতৃভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের আগে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিশু শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিখতে বাধ্য করা উচিত নয়। যদি দ্বিতীয় ভাষা শেখায় কোনো সুফল পেতে হয় তাহলে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন অগ্রাধিকার পাবে।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা শেখাতে হলে যে পরিমান অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল। এর চেয়ে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পক্ষে সহজ সাধ্য।

ভারতে ইংরেজি ভাষার জীবন এখন প্রেতের মতো। পরীক্ষার খাতায় এই প্রেতের সাক্ষাৎ

মেলে। প্রেটোর শিক্ষকর্মের যেমন কোনো অস্তিত্ব নেই অথচ তার উল্লেখ আছে তেমনি পরীক্ষার উত্তরপত্রগুলিতে ইংরেজি ভাষার সঠিক অবয়বের সাক্ষাৎ মেলে না। একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে—নবীন শিক্ষক ও তার ছাত্রেরা ইংরাজী বিদ্যায় সমান পারদর্শী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম থেকে ইংরেজির স্থানান্তর ঘটাবার পর বিদ্যালয়স্তরে ইংরেজির যে পাঠক্রম হবে তা আগের ব্যবস্থার থেকে ভিন্নরূপ নেবে। প্রধান লক্ষ্য হবে ইংরেজি বই ও পত্রপত্রিকা ঠিকমত পড়ে বোঝা।

পঞ্চম শ্রেণীর আগে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করতে হবে।

National council of Educational Research and Training (GOI), Report of the Education Commission, 1964-66.-এর চেয়ারম্যান : Dr. D. S. Kothari. বলেন,

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে (১ম—৪র্থ শ্রেণী) শিশু কেবল শিক্ষার মৌলিক ব্যাপারগুলি শিখবে যেমন, পড়তে শেখা, লিখতে শেখা এবং তার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। এই স্তার মাতৃভাষার শিক্ষা দৃঢ় ভিত্তিমূল করার জন্যই অন্য কোনো ভাষাশিক্ষা দেওয়া হবে না।

মর্মার্থ : উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (৫ম—৬ষ্ঠ শ্রেণী) মাতৃভাষার সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষার প্রচলন হবে।

নিম্ন প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক শিক্ষণীয় একটি ভাষাই থাকবে, সেটি হবে মাতৃভাষা নয়তো আঞ্চলিক কোনো ভাষা।

গ্রন্থাগারের ভাষা হিসাবে ইংরেজি আরো বহুদিন ভারতে থাকবে। সেই কারণে বিদ্যালয় স্তর থেকেই ইংরেজি শেখানোর উপর জোর পড়া দরকার। এর প্রথম পাঠ পঞ্চম শ্রেণী থেকে হতে পারে কিন্তু আমরা মনে করি অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে, বিশেষ করে গ্রামের বিদ্যালয়ে, আগে শুরু নাও হতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রক নিযুক্ত সমীক্ষক দল মনে করেন তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক। আমরা এই মত অনুমোদন করি। ইংরেজির মতো একটি বিদেশী ভাষা শেখাবার আগে মাতৃভাষায় ছাত্রের যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। আমাদের সুপারিশ হল যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ইংরেজি ৫ম শ্রেণীর আগে শুরু করা যাবে না।

Ministry of Education & Culture (GOI), Report of the Committee of members of Parliament on Education—National Policy on Education, 1967.-এর চেয়ারম্যান : Dr. Triguna Sen, Union Minister of Education, বলেই,

শিক্ষার মাধ্যম যে ভাষা কেবলমাত্র সেই একটি ভাষাই শিক্ষার প্রথম উপ-বিভাগে পড়াতে হবে। আবশ্যিক ভাবে দ্বিতীয় ভাষা পড়ানো শুরু হবে পরের শিক্ষাস্তর থেকে—এই ভাষাটি সংবিধানের অষ্টম তালিকাভুক্ত ভাষা হতে পারে কিংবা ইংরেজি ভাষা অথবা অন্য কোনো ভাষা। বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভাষাটি শেখাতে হবে।

Minisiry of Education & Culture (GOI), Recommendation of the Central Advisory Board of Education, 1967 :—

পঞ্চম শ্রেণীর নিচে ইংরেজি পড়ানো হবে না। এরপরে শিক্ষার কোন স্তর থেকে ইংরেজি চালু করা হবে তা ঠিক করবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা সমিতি এই ব্যবস্থা জাতীয়স্তরে চালু করার জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে। যত শীঘ্র সম্ভব এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলি স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।"

সংগ্রামী হাতিয়ার, এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যা থেকে পুণর্মুদ্রিত। পশ্চিমবঙ্গ সম্পাদক

---

## নাগরা আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান

গত ১৭ ও ১৮ এপ্রিল নাগরা নীরদা দেবী আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের দুদিনব্যাপী পুনর্মিলন উৎসব ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পায়রা উড়িয়ে ও বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রয়াত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতি স্তম্ভেও মাল্যার্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও জেলার সুপরিচিত প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ পাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংবর্ধনা, প্রাক্তন ছাত্রদের 'যে যা পারে' অনুষ্ঠান, তাছাড়া লাঠিখেলা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন, 'অভিসার' নৃত্যনাট্য, ঋতুরঙ্গ, 'মহেশ' নাট্যানুষ্ঠান, কলিকাতা লোকরঞ্জন শাখার তরজা গান, যোগব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রদর্শন, আদিবাসী নৃত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শরীরচর্চা ও তরজা সমবেত দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দান করে।

## হাসপাতালে হামলাবাজির মোকাবিলা করতে কর্মচারী কমিটি গঠন

রাজ্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কমিটির একটি উপ-কমিটি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, হাসপাতালে হামলাবাজি নিয়ন্ত্রণ এবং মোকাবিলা করার জন্য কর্মচারী কমিটি গঠন করার সুপারিশ করেছেন। স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ বিভাগের আওতাধীন হাসপাতালের ক্ষেত্রে সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ বিভাগ এই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। স্থির করা হয়েছে শিক্ষাদানকারী হাসপাতালের অধ্যক্ষদের এই কমিটির সভাপতি হিসেবে নেওয়া হবে। সুপারিনটেণ্ডেন্ট হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক উপ-সভাপতি হবেন এবং অন্যক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত হাসপাতালে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই সেখানে তাঁরা সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসা আধিকারিকগণ, শিক্ষাদানরত হাসপাতালের শিক্ষকগণ, গ্রেড-১ নার্সবৃন্দ, শিক্ষাদানকারী হাসপাতালের ইণ্টারনী এবং ছাত্রবৃন্দ থেকে একজন করে প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য হবেন। তাছাড়া কর্মচারীদের প্রতিটি নিবন্ধনভুক্ত স্বীকৃত ইউনিয়ন থেকেও একজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হবে।

সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে হাসপাতালের কাজ চালানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করাই হবে এই কমিটির কাজ। এই কমিটি যেকোন ছোটখাটো বিবাদের মীমাংসা করা, জনসংযোগ রক্ষা করা, রোগীদের স্বার্থ এবং সমস্যাদি দেখা, কর্মচারীদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা এবং দক্ষতার সঙ্গে হাসপাতাল পরিচালনার ব্যাপারে সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করবে

# পুস্তক পরিচয়

## সুকান্তের জীবন ও কাব্য
**ডঃ সরোজ মোহন মিত্র**
**গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**
**কলকাতা-৭৩**
**মূল্য পনের টাকা**

তিন বছরের মধ্যে একখানি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ রীতিমত শ্লাঘনীয়। ডঃ সরোজমোহন মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচকরূপে সুপরিচিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর তাঁর গবেষণা স্বাভাবিকভাবেই সুকান্তের ওপর প্রসারিত হয়েছে এবং 'সুকান্তের জীবন ও কাব্য' গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় করেছে। তবে ভূমিকায় লেখকের গ্রন্থখানির ৩০০ কপি প্রথম মাসেই বিক্রী হবার আনন্দদায়ক উল্লেখন থেকে এটাই বোঝা যায় যে লেখক বা লেখার থেকে সুকান্তের জীবন ও কাব্যকে জানার গণআগ্রহটাই এক্ষেত্রে প্রবলতর। আরও বোঝা যায় যে সুকান্তের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিবহাল হওয়া সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে জনচিত্তে যে প্রবল চাহিদা সৃষ্টি হয় ডঃ মিত্র ঠিক সময়মত তার যোগান দিতে পেরে সাফল্য লাভ করেছেন।

সুকান্তের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের কথা জানার যে আগ্রহ কোনো লেখকই কিন্তু আজও তা পূর্ণ করতে সক্ষম হন নি। সুকান্তের অপরিণত বয়সে হঠাৎ মৃত্যুজনিত বেদনা এবং অপরিণত বয়সে অতি পরিণত কবিতা রচনাশক্তির বিস্ময় ও আনন্দ জনচিত্তকে যত উদ্বেল করেছে, —সুকান্তের প্রতি জনসাধারণের ভালবাসাকে সময় যত বাড়িয়ে তুলেছে, ততই সুকান্তের কাছের মানুষেরা স্মৃতিচারণা করে চলেছেন, কিন্তু কোনটাই মানুষের সুকান্ত সম্পর্কে জানার চাহিদা শেষ করতে পারছে না। সরলা বসু, অরুণাচল বসু এবং অশোক ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ডঃ সরোজ মোহন মিত্রের আগে ও পরে সুকান্তের জীবন ও কাব্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। সব গুলিই প্রায় সমান জনপ্রিয় হয়েছে। এর দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলির গুণগত মান যতটা না নির্ধারিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি নির্দেশিত হয়েছে কবি হিসাবে সুকান্তের প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ ও ভালবাসা। চর্ম রোগের অসংখ্য মলম যেমন প্রমাণ করে যে কোনোটাই ঐ রোগের নিরাময়ে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেনি, তেমনি সুকান্ত সম্পর্কে এতগুলি বই এবং সবগুলিরই চাহিদা প্রমাণ করছে, সুকান্ত সম্পর্কে জনসাধারণের প্রশ্ন ও আগ্রহগুলির সম্পূর্ণ জবাব কারও লেখাতে আজও মেলেনি।

আপেক্ষিকভাবে ডঃ মিত্রের গ্রন্থখানিকে সুকান্তের কাব্য বিচারের জন্য না হলেও সুকান্তের জীবন ও যুগ বিচারে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। বিশেষতঃ যথার্থ মার্কসবাদী নান্দনিকের মতো সুকান্তের জীবন ও কাব্যবিকাশের পটভূমিটিকে বিরাট ক্যানভাসে ধরেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, ফ্যাসিবাদ ও তার প্রতিরোধ, প্রগতি লেখক শিবির প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা বহুল উদ্ধৃতি ও তথ্যপূর্ণ করে যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে সুকান্তের জীবন ও কবিতার দ্বান্দ্বিক বিকাশ চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে। তবে যাঁরা মার্কসবাদী পাঠক নন, তাঁদের কাছে এই সুবিস্তৃত ভূমিকা প্রয়োজনের বেশী এবং কতকটা 'ধান ভাঙতে শিবের গীত' মনে হতেও পারে।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি সংযোগের পূর্বে কাব্যচর্চা, ফ্যাসিবিরোধী কবিতা, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের কবি' কিশোর বাহিনীর পরিচালক কবি, সমাজ সচেতনতা, পত্রগুচ্ছে ব্যক্তি মানুষ প্রভৃতি অধ্যায় বিভাগ থেকেই লেখকের সুকান্ত সম্পর্কে বক্তব্য ও অভিপ্রায় বোঝা যায়। সর্বত্র লেখকের কলম যুক্তিনিষ্ঠ, সুসঙ্গত, তথ্যময়। তবে লেখক যেন অপরের স্মৃতিচারণার ওপর একটু বেশী নির্ভরশীল, তাই গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থানই উদ্ধৃতি কন্টকিত। তাছাড়া সুকান্তের কবিতার 'কন্টেন্ট' বা 'অন্তর' নিয়ে যতটা বিশ্লেষণ করেছেন, ছন্দ, অলংকার, ব্যঞ্জনা ও রস নিয়ে ততটা আলোচনা না থাকায় সুকান্ত জীবনের ও কাব্যের রাজনৈতিক দিক যতটা এ গ্রন্থে পাওয়া যায় নান্দনিকতা ততটা মেলে না। অথচ আজ যে সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং জীবনানন্দের সমতুল আপামর বাঙ্গালীর অন্যতম প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ কবি তার কারণ কবিতার রাজনৈতিক সংগ্রামী চেতনা চিরন্তন মানবিকতা ও সৌন্দর্য-চেতনার মধ্যে আত্মনিমগ্নতা মার্কসবাদকে মানবতাবাদ ও নন্দনবাদে একাত্ম করতে পেরেছিলেন বলেই না সুকান্ত বুদ্ধদেব বসুদের মিথ্যা ও তুচ্ছ প্রমাণ করে আমাদের অন্যতম জাতীয় কবি হয়ে উঠেছেন! দুর্ভিক্ষ, মড়ক যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা সম্বল করে একান্ত নিজের যুগের কবি হয়েও কেন সুকান্ত নজরুলের মতো 'হুজুগে'র কবি না থেকে 'চিরকালের কবি' হতে পারলেন, কি গুণে ও কাব্যিক কৌশলে তাঁর কবিতা সমকালীন হয়েও চিরকালীন হল, আজকের মানুষ সমালোচকগণের কাছে তা জানাতে চান।

ডঃ মিত্র এই কাজে পথিকৃৎ, যদিও কাজটা তিনি অসম্পূর্ণ রেখেছেন। তাঁর অন্যতম সাথী অনুনয় চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুকান্ত বিষয়ক গ্রন্থে এ দিকটা প্রাঞ্জল করেছেন, এ অনেকটা যেন চৈতন্য জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ মতোই।

ডঃ মিত্র তাঁর গ্রন্থে পূর্ব ও উত্তর সূরী সুকান্ত আলোচকগণের পরিবেশিত অনেকগুলি অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছেন। 'পত্রগুচ্ছে ব্যক্তি মানুষ' অধ্যায়ে সুকান্তের গদ্য রচনার হাত ও হৃদয়ের সংবেদনশীলতা ভারি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, যদিও কেন যে গ্রন্থকার ঐ পত্র গুচ্ছে ইঙ্গিতে উল্লেখিত বহু ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কের দিকগুলি ঐতিহাসিকের তথ্যসন্ধানী মন নিয়ে খুঁজে বার করে উদঘাটিত করলেন না, সে ক্ষোভ থেকেই গেছে। সুকান্তের জীবন একেই তো নাতিদীর্ঘ, তদুপরি তা এখনও অনুদঘাটিত। টুকরা টুকরা স্মৃতিকথা সেলাই করে সুকান্তের জীবনের পূর্ণাঙ্গ নক্সী কাঁথা একদিন ডঃ মিত্র রচনা করবেন, এই আশা তাঁর কাছে রাখা যায়। গোপনীয়তা, কিছু তথ্য চেপে যাওয়া, কিছু তথ্যকে অযথা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া, এসব প্রবণতার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী সমালোচক এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণখানিকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী'র আকারে 'সুকান্ত জীবনী করুন, এই প্রার্থনা। সব মিলিয়ে ডঃ মিত্র এ গ্রন্থে যে মৌলিক চিন্তাভাবনা, মননশীলতা, তথ্যানুসন্ধিৎসাদির স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে এ আশা সার্থক হবেই।

**সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়**

## চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিত রায় (প্রথম খণ্ড) : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশনা : ফিল্ম স্টাডি সেন্টার, আসানসোল। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮০। দাম : ২৫ টাকা।

ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি গ্রন্থ জাতীয় পুরস্কার লাভ করলো—"রজত কমল"। এবং সেই গ্রন্থটির

নাম "চলচ্চিত্র, সমাজ ও সত্যজিত রায়। লেখক সুদূর আসানসোলের বাসিন্দা অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। দীর্ঘ ১০/১২ বছর দেশীবিদেশী চলচ্চিত্রের অংগনে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে প্রত্নতাত্ত্বিকের মত অনুসন্ধান করেছেন চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কটিকে অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। কোটি কোটি মানুষের মনে চলচ্চিত্রের যে বিরাট প্রভাব, তার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়দায়িত্বের প্রশ্নটিকে বারবার আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের ভাষা, তার উন্নত আঙ্গিক প্রকরণ, বিদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের ভূমিকা—এসব নিয়ে চলচ্চিত্রের শিক্ষা শিবিরে অনুগত ছাত্রের মত অমিতাভবাবু নিজেকে অভিজ্ঞ করেছেন। অর্থাৎ চলিষ্ণু সমাজের মাটিতে পা রেখে সংস্কৃতির সবচেয়ে গণমাধ্যম চলচ্চিত্রের কোন দিকটিকেই তিনি অস্বীকার করেননি, আলগোছে স্পর্শ করে বিজ্ঞ হতে চাননি নিছক সমালোচক হয়ে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টাও করেননি। এতখানি গভীরতা দিয়ে তিনি একাজ করতে পেরেছেন, তার কারণ, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি একজন প্রত্যক্ষ শরীক। সুস্থ সংস্কৃতির আন্দোলনে নিত্যদিন তাঁর পদচারণা। তাই বর্তমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে তার কারণ জেনে নেওয়া, চলমান মানুষের বিবর্তনীয় মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমাজ ও জীবনের অনিবার্য যোগসূত্র, সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর সামনে থাকার ফলে চলচ্চিত্রের আলোচনায় সেগুলি যুক্ত হয়ে এক মূল্যবান সম্পদ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষের বন্দিত কণ্ঠস্বর এবং সম্প্রতি জাতীয় পুরস্কার 'স্বর্ণ কমল' লাভ করার ঘটনা নিঃসন্দেহে লেখকের নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ-জীবন ও চলচ্চিত্রকে গ্রন্থীভূত করার মহতী ভূমিকার অনিবার্য স্বীকৃতি।

অমিতাভবাবু তাঁর আলোচনাটিতে সমাজকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়বদ্ধতা, মানুষের সুস্থ সুন্দর গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে চলচ্চিত্রের দায় দায়িত্ব, দেশ বিদেশের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সহযোগে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌক্তিকতার মধ্যে উপস্থিত করেছেন—এবং সমগ্র এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হাতে তিনি স্থাপন করেছেন বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিরাট পুরুষকার শ্রীসত্যজিত রায়কে। উৎসর্গ পত্রে লেখক অর্ঘ দিয়েছেন এই বলে "—পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" সেই অবিস্মরণীয় পরিচালক স্রষ্টাকে যিনি আমার চোখে প্রথম উদ্ঘাটিত করেন চলচ্চিত্রের মহৎ সত্যকে।"

অমিতাভ বাবুর এই শ্রদ্ধা বিনম্র ভক্তিকে আমরাও শ্রদ্ধা জানাই। যাঁর মাধ্যমে লেখক চলচ্চিত্রের মহৎ সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের যে মহৎ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—তারজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। চলচ্চিত্রের দর্শক চলচ্চিত্র বুঝতে সাহায্য পাবে। এ কাজটি সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক চলচ্চিত্র ও সমাজ ভাবনাকে অঙ্কুরিত এবং বিকশিত করেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র মাধ্যমে। প্রথম খণ্ডে সত্যজিত বাবুর মোট ছ'টি চলচ্চিত্রের আলোচনা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে ( পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপুর সংসার, পরশ পাথর, জলসাঘর ও দেবী )। তার মধ্যে পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও অপুর সংসার সিংহভাগ আসন নিয়ে বসে আছে। সেটাই প্রত্যাশিত। লেখক যথার্থভাবেই বলেছেন—'কালোত্তীর্ণ চিত্রত্রয়ী'। খুব মনোযোগ দিয়ে গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যাবে একদিকে মহৎ স্রষ্টার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও স্বীকারোক্তি এবং অন্যদিকে সমালোচকের সততা বজায় রেখে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় সত্যতথ্যের দ্বারোদ্ঘাটন—এ দুটি দিক আশ্চর্য দক্ষতায় মিলেমিশে বৈভবে উদ্ভাসিত—ঠিক যেন তেলসিক্ত প্রদীপের সলতের বুকে উদ্ভাসিত আলোর দ্যুতি।

আজকের দুনিয়ায় সত্যজিত রায়-আলোচনায় মুখর। পশ্চিমী সমালোচকরা কত ভাবে যে তাঁর প্রশংসা করেছেন তার ঠিক নেই। এদেশে এবং বিশেষ করে বাংলা দেশে পত্র পত্রিকার পাতায়, অনেক গ্রন্থে সত্যজিত রায়কে নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। সমাজ পরিপ্রেক্ষিতেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এর আগে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, এমন সোচ্চার বলিষ্ঠ আলোচনা যে নিশ্চয়ই হয়নি একথা জোর দিয়ে বলা যায়। বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিত রায় এবং মৃণাল সেন যেমন পাশাপাশি অবস্থান করেন আমাদের কাছে ( ঋত্বিক ঘটকের জীবনাবসানের পর ), তেমনি এই দুজনকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সময় দুটি বিভক্ত শিবিরও আমাদের চোখে পড়ে। তা সে কফিহাউস হোক আর পত্র পত্রিকার পাতাতেই হোক। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতার পরিমণ্ডলে চলচ্চিত্রের যে দায়বদ্ধতা তাকে স্মরণে রেখে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, উভয়ের বৈপরীত্য, অসম্পূর্ণতা, দর্শক-প্রত্যাশার অপূর্ণতা, উভয়ের জাগতিক ও শৈল্পিক জগতের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে সত্যনিষ্ঠ যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার মানসিকতা আজকের অনেক সমালোচকরাই হারাতে বসেছেন। অমিতাভবাবুকে ধন্যবাদ তিনি এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে এসেছেন। একচক্ষু হরিণের মত পশ্চিমী দুনিয়ার সমালোচকদের ভারতের সমাজ জীবনের বাস্তবতা বোধ বর্জিত সমালোচনার ভঙ্গীকে লেখক যেমন শাণিত আক্রমণ করেছেন, তেমনি তার পাশাপাশি গুণধর্মের অনুষঙ্গ হিসাবে সমালোচনার যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন। সত্যজিত রায়কে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছেন বিনম্র ভাবে। আবার সত্যজিত বাবুর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য তুলে ধরে এবং তার পাশাপাশি তাঁর চলচ্চিত্রের মূল্যায়নের মাধ্যমে সুদক্ষ স্রষ্টার যুক্তিহীন বৈপরীত্যকে তুলে ধরেছেন। একথা হয়তো ঠিক যে, লেখকের সমালোচনা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সবাই একমত না হতে পারেন—কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণে সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর আলোচ্য গ্রন্থখানি পরবর্তীকালে সমালোচনা ও বিশ্লেষণের স্বতঃস্ফূর্ততাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ করতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করবে। সংস্কৃতি কর্মী এবং সচেতন দর্শক ও পাঠকদের কাছে বইখানি একটি অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কলকাতা থেকে অনেকটা পথ দূরে ধূলি-ধূসরিত শিল্পাঞ্চলে বাস করে অমিতাভবাবু অনলস পরিশ্রমে তাঁর বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন, আশা করবো তার দ্বিতীয় খণ্ড দ্রুত প্রকাশিত হয়ে আমাদের ভাবনার গতিপথকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। গণশক্তি প্রিন্টার্স বইখানি যে যত্ন নিয়ে ছেপেছেন তার পরিচয় গ্রন্থটির সর্বাঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। চলচ্চিত্রের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে সংযোজিত হয়েছে। শিল্পী দীপক দে-র প্রচ্ছদখানি সত্যিই আকর্ষণীয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# গ্রামবাংলার সংবাদ দর্পণে

## কলকারখানা, কেন্দ্রীয়-রাজ্য সরকারী অফিস স্বাভাবিক

এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত খবর এসেছে তাতে দেখা যায় ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কারণ বিশেষ করে শ্রমিক ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের খেটে খাওয়া মানুষ সম্পূর্ণরূপে এই ধর্মঘট প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিশেষ করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার, আই-ও-সি, ডক প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক কর্মচারীদের উপস্থিতির হার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। জেলার কালেক্টরেট, ডাক ও তার সহ বিভিন্ন দপ্তরে ও বি-ডি-ও অফিস-সহ রাজ্য সরকারের সমস্ত অফিস এবং বেসরকারী অফিসগুলিতে উপস্থিতির হার বেশ স্বাভাবিক। রেলের কিছু দপ্তরে উর্দ্ধতন অফিসারেরা চাবি নিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার ফলে অফিস খোলা না থাকার জন্য বেশ কিছু কর্মচারীরা কাজে এসেও ফিরে যান। অধিকাংশ স্কুল কলেজই খোলা ছিল।

—পূর্বলক্ষণ—৭.৪.৮১

## বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি ভারতের অখণ্ডতার শত্রু

বাঁকুড়া ২৯শে মার্চ : আজ বাঁকুড়া ক্রিশ্চান ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির ৫৩তম রাজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণের উপসংহারে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকার উপদেশ দেন। বলেন এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।

—অভিযান—৫.৪.৮১

## বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরীতে 'জ্ঞানপীঠে'র কৃতিত্ব

দেশবাসীর মনে সমাজ চেতনার ও বৈজ্ঞানিক চেতনার জাগরণ ঘটানো এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মালদহের একটি বিজ্ঞান 'জ্ঞান পীঠ' কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক [illegible] মেলায় এঁদের আবিষ্কৃত 'ভোট গণনা মডেলটি' ১নং পুরস্কার পেয়েছে। কলকাতার প্রদর্শনীতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীকান্তি ভূষণ বিশ্বাস মডেলটির প্রশংসা করেছেন। এই যন্ত্রের বিশেষত্ব এতে অর্থ ও সময় দুইই বাঁচবে। ভোট নষ্ট হবে না।

জ্ঞান পীঠের কর্মশালা থেকে ইতিপূর্বে ট্রেন দুর্ঘটনা নিরোধক এক অভূতপূর্ব মডেল "স্বয়ংক্রিয় রেল ইঞ্জিন" (সেলফ্ গাইডেড লোকোমোটিভ) নির্মিত হয়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এতে আছে এমন একটি কৌশল যাতে একই লাইনে (সামনে বা পিছনে) দুটো ট্রেন এসে সংঘর্ষের সম্মুখীন হলে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন নির্দিষ্ট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে যাবে। এর প্রস্তুত কারক অন্যতম সদস্য শ্রীঅশোক মিত্র। এত উপকারী যন্ত্রটির প্রতি ভারত সরকারের কোন দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় জ্ঞানপীঠের ক্ষোভ আছে। ১৯৮০ সালে তৈরী—অপর এক সদস্য শ্রীসঞ্জয় নন্দীর মডেলটি ছিল—"বিকলাঙ্গদের সুবিধার্থে আধুনিক ও উন্নতমানের স্বাভাবিক যন্ত্র"। এটিও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

—মালদার খবর—২৮.৩.৮১

## আঞ্চলিক নাট্য উৎসব

মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া এই তিনটি জেলাকে নিয়ে আঞ্চলিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হল স্থানীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে ১৬ থেকে ২২শে মার্চ। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি জেলার মোট ১৪টি নাট্য সংস্থা ও কলকাতার ২টি নাট্য সংস্থা তাদের নাটক মঞ্চস্থ করেন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে সরকারের এই পদক্ষেপ অভিনন্দন-যোগ্য। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি নাট্য সংস্থা যাঁরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রশংসা পত্র প্রদান করেন 'প্রদীপ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচিত্ত কুণ্ডু। জেলা তথ্য আধিকারিক (উত্তর) তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানান। যে সমস্ত নাট্যামোদী মানুষ এই নাটকগুলি দেখতে এসেছিলেন এবং যাদের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে এই মঞ্চে যে নাটকগুলি দেখানো হল তার মধ্যে থেকে তিন চারটি নাটক কেন্দ্রীয় নাট্যোৎসবে যোগদান করবে এবং আগামী দিনে যাতে আরও বেশী নাট্য সংস্থা নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ পায় তার প্রতি নজর রাখারও আশ্বাস দেন।

—চলমান—২৪.৩.৮১

২৮শে মার্চ মধ্যাহ্নে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমেন্দ্রনাথ পোদ্দার। পৌরহিত্য করেন অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী। প্রধান অতিথির ভাষণে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। শিক্ষার প্রয়োজন ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সাহায্য নগণ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। তিনি বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার প্রসারের কথা বলেন।

## বাঁকুড়ায় বন্ধের জের

বন্ধের দিন বড়জোড়া থানার মালিয়াড়ায় নিহত পুলিশ কনস্টেবল অরিমর্দ্দন পাণ্ডের মৃতদেহ নিয়ে ৪ঠা এপ্রিল বাঁকুড়ায় প্রায় এক হাজারের ওপর পুলিশের একটি মৌন মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তীব্র উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। মিছিলের সাথে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার ছিলেন।

—অভিযান—১২.৪.৮১

---

## সংস্কৃতি সংবাদ

( ১১০৩ পৃষ্ঠার পর )

পরে কৃতি প্রতিযোগী সহ অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞান পত্র প্রদান করেন জেলাশাসক শ্রীমতী কস্তুরী গুপ্ত মেনন।

## 'দিশারী বার্নপুর আয়োজিত নাট্যোৎসব-৮১'

'বার্নপুর ভারতী ভবনের মঞ্চে 'দিশারী বার্নপুর' আয়োজিত তিনদিনের নাট্যোৎসব গত ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেই এই নাট্যোৎসবের আয়োজন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ভাগা—ধানবাদের বহুরূপ নাট্য সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'তীর'। দ্বিতীয় দিন অভিনীত হয় দুটি একাংক নাটক। শ্রীপুরের চিত্তরঞ্জন নাট্য সংস্থার 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ও আসানসোলের সতীর্থ শিল্পী সংসদের 'ঝড়ের খেয়া'। তৃতীয় ও শেষ দিনে অভিনীত হয় 'দিশারী বার্নপুর' প্রযোজিত মনোজ মিত্রের প্রহসন 'শিবের অসাধ্য'। এছাড়াও তিনদিনের নাট্যোৎসবে বিশ্বনাট্য প্রবাহের উপর স্থির চিত্র প্রদর্শনী ছিল উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ।

# গ্রামীণ সংবাদ

## গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

৩০ এপ্রিল ১৯৮১ বিকালে এক বিরাট জনসমাবেশে বাসুলিয়া (মহিষাদল) গ্রামীণ হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করলেন পশ্চিম বংগের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। এই উপলক্ষে মহিষাদল ২নং উন্নয়ন সংস্থার গ্রামীণ স্বাস্থ্য স্বেচ্ছা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরেরও উদ্বোধন করা হয়। মন্ত্রী মহোদয় স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সর্বদা তাঁরা যেন স্বেচ্ছাপরায়ণ মনোভাব নিয়ে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেন। গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য, শিশুপুষ্টি ও মাতৃমঙ্গল সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হবে।

মন্ত্রী এক বিরাট জনসমাবেশে গ্রাম বাংলার স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বামফ্রন্ট সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সম্পর্কে বিভিন্ন পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এক্স রে ও প্যাথলজি বিভাগ সজ্জিত এই গ্রামীণ হাসপাতালটি স্থানীয় জনজীবনের যথেষ্ট প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় বিধানসভা সদস্য শ্রীবঙ্কিম বিহারী মাইতি ও মহিষাদল ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল।

ঐদিন সন্ধ্যায় খেজুরবেড়িয়া (নন্দকুমার) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনও করেন শ্রীভট্টাচার্য। এক বিরাট জনসমাবেশে মন্ত্রী মহোদয় আশা প্রকাশ করেন যে স্থানীয় জন-সাধারণ ও সরকারি কর্মী সহযোগে এতদ্-অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সমস্যাগুলি এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে শ্রীবঙ্কিম বিহারী মাইতি, মহিষাদল ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীঅজিতকুমার মাইতি ও মহিষাদল ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

## অলচিকি লিপির শিক্ষণ শিবির

গত ২৩ এপ্রিল, ঝাড়গ্রাম নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ১৯টি নিবিড় আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের ৩০ জন আদিবাসী প্রাথমিক শিক্ষককে নিয়ে অলচিকি লিপিতে শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ শম্ভুনাথ মান্ডি। তিনি বলেন: আদিবাসীদের ৩৮টি গোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতা জ্ঞান শতকরা ১০ জনের নীচে। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে এই প্রথম আদিবাসীদের নিজস্ব লিপি অলচিকি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ওড়িশা ও বিহার রাজ্যের বিস্তির্ণ এলাকা আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব ভাষা চালু হয়নি। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩৩ বৎসর পরে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮০ সালে অলচিকি ভাষাতে আদিবাসীদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আজ তারই বাস্তবরূপ আপনাদের সহযোগিতায় শুরু হল।

জেলা বিদ্যালয় পর্যদের সভাপতি শ্রীদীপক সরকার বলেন—মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করতে বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর। তাই এই ৭ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল। এর যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবেন। পর্যায়ক্রমে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চলবে। তিনি ক্ষোভের সংগে বলেন পশ্চিমবংগের কিছু বুদ্ধিজীবী মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সমা-লোচনা করে বিরুদ্ধাচরণ করছেন। মনীষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

বাঁকুড়া জেলার রায়পুরের বিধানসভার সদস্য শ্রীউপেন কিস্কু বলেন—অলচিকি প্রবর্তক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ১৯২৫ সালে এই ভাষায় শিক্ষা চালু করতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ ৫৬ বৎসর পর বামফ্রন্ট সরকার অলচিকি ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে আদিবাসীদের মধ্যে উৎসাহের প্রেরণা জুগিয়েছেন।

## বার্ধক্য কৃষি ভাতা মঞ্জুরী পত্র প্রদান অনুষ্ঠান

১৯ এপ্রিল, ১৯৮১, রবিবার মেদিনীপুর সদর (উত্তর) মহকুমার মেদিনীপুর (সদর) পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলের ৬৭ জন কৃষককে বার্ধক্য পেনসন মঞ্জুরী পত্র প্রদান করা হয়। জেলা পরিষদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর (সদর) পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ রিয়াজুদ্দীন পাঠান এবং প্রধান অতিথি হিসাবে কৃষকদের মঞ্জুরী পত্র প্রদান করেন মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীবাহেশ্বর সিং। সভায় বিভিন্ন বক্তা এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

## স্বল্প-সঞ্চয় আলোচনাচক্র

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত খড়িয়াময়নাপুরে (হাটগাছা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত) স্বল্প সঞ্চয়ের এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি শ্রীশিবপদ সেনগুপ্ত এবং জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের আঞ্চলিক সহকারী



চারদিন ব্যাপী রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক উৎসবের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সাঁওতাল আদিবাসীদের তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুগরু মাডিকে পুরস্কার দিচ্ছেন দিচ্ছেন প্রধান শ্রীনির্মল মুখার্জী সভাধিপতি জেলা পরিষদ মুর্শিদাবাদ

অধিকর্তা শ্রীপি. কে. নাথ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে মহকুমা শাসক শ্রীঅর্ধেন্দু শেখর বিশ্বাস এবং শ্রীঅঞ্জলী ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, এইদিন স্থানীয় পোস্ট অফিসের সেভিংস একাউন্টে একলক্ষ টাকা জমা পড়ে এবং প্রায় ২৮২-র উপর একাউন্ট খোলা হয়। ১৯৭৯-৮০ সালেও হাটগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। পঞ্চায়েত সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রামবাসীদের স্বল্প সঞ্চয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

## ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের মোকাবিলা

গত ১২ই এপ্রিল, বিকেলে তিন/চার মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে রামনগর ২নং ব্লকের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশী। ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ সিন্দুরিয়া, জাতিমাটি, পদাধরপুর ও দত্তপুর গ্রামগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ক্ষণিকের ঝড়ের তাণ্ডবে সাধারণ মানুষের বিপন্ন জীবনকে পুনরায় সুন্দর ও সাধারণ করার জন্য সরকার যথাশক্তি দিয়ে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন বিভাগের তৎপরতায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করছেন। ইতিমধ্যে সমষ্টি উন্নয়ন ( রামনগর ) কার্যালয়ের মাধ্যমে কিছু পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। মহকুমা কার্যালয় থেকে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। রামনগর ব্লক থেকে বিভিন্ন গ্রামের প্রয়োজনের ভিত্তিতে চারটি নলকূপ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা, ইনজেকশান প্রভৃতি দেওয়ার কাজ চলছে।

কিছুদিনের মধ্যেই সরকার থেকে বিপন্নদের বাড়ি তৈরীর জন্য অনুদান ও বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

## বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৬ এপ্রিল '৮১ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন বারাসাত শাখা কর্তৃক এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে অতিরিক্ত জেলা শাসক ( ২৪ পরগণা উত্তর ) শ্রীরাম সেবক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যে কর্মসূচি নিয়েছে সেটাকে কি ভাবে রূপায়ণ করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভাবতে হবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "আগামী ২000 সালের ভেতর সকলের জন্য স্বাস্থ্য"—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই শ্লোগান রূপায়ণে সাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনা বোধ জাগিয়ে তোলা দরকার।

বিধানসভার সদস্য শ্রীসরকারের বলেন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম অঞ্চলে ডাক্তারদের অভাব পূরণের জন্য স্বল্প মেয়াদী এক মেডিক্যাল শিক্ষাক্রম চালু করেছেন। তবে এটাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নয়। গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব আছে বলেই পরীক্ষামূলকভাবে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

## স্বল্প- সঞ্চয় পুরস্কার

স্বল্প সঞ্চয় অভিযানে সাফল্যের জন্যে রাজ্য সরকার ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য বর্ধমান জেলাতে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বল্প সঞ্চয় সংস্থার সহকারী আঞ্চলিক অধিকর্তা শ্রী[illegible] বসু এই অর্থ বর্ধমানের জেলা শাসক শ্রীকুমারকান্তি দাসের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীতিমিরবরণ সেনগুপ্ত স্বল্প সঞ্চয়ে কৃতী একশত তেইশজন এজেন্টকে নগদ টাকা পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন—এদের মধ্যে আঠারো জন মহিলা আছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরে স্বল্প সঞ্চয়ে ১৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সে ক্ষেত্রে, সংগৃহীত হয়েছিল ১৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা।

বর্তমান আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে ১৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

## গ্রামীণ শিল্প পরিকল্পের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সহায়তা পরিকল্পনার অধীনে ১৫টি জেলায় গ্রামীণ শিল্প পরিকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে ৬০,00,000 টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই জেলাগুলি এই পরিকল্পের আওতায় আসবে :—মেদিনীপুর, বীরভূম হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ পশ্চিম-দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা, নদীয়া, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া।

মোট ব্যয়ের মধ্যে ২৪ পরগণা জেলা সবচেয়ে বেশি অর্থ পাবে—প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা। পুরুলিয়া জেলার ভাগে সবচেয়ে কম পরিমাণ অর্থ পড়বে—১.৮১ লক্ষ টাকা, অন্যান্য জেলাগুলির জন্য ধার্য অর্থ ২ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ টাকার মধ্যে।

এই পরিকল্পগুলিতে গ্রামীণ শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন প্রকার শিল্পসংক্রান্ত এবং প্রক্রিয়া ইউনিট স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রথাগত বাণিজ্য এবং হস্তশিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থাও থাকবে। ৭৫ শতাংশ ভর্তুকিসহ যন্ত্রপাতির বাক্স সরবরাহ করা হবে।

তফসিলী সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের জেলা কল্যাণ কমিটি এবং জেলা পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতি জেলায় ইউনিটের সংখ্যা, তাদের অবস্থানের জায়গা, সুযোগ সুবিধা এবং পরিকল্পগুলি রূপায়ণকারী সংস্থা ইত্যাদি চূড়ান্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির ডেপুটি কমিশনার জেলা শাসক এবং জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহক আধিকারিকের দায়িত্বে অর্থ ন্যস্ত করা হবে।

## তফসিল ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ১ কোটি ৫ লক্ষাধিক টাকা

১৯৮১-৮২ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বই অনুদান ও পরীক্ষার ফী দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি পরিকল্প অনুমোদন করেছেন। এতে ১ কোটি ৫ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হবে এবং রাজ্য সরকার এই ব্যয় অনুমোদন করেছেন।

আদিবাসী এলাকা উপ-পরিকল্পনাধীন এলাকার আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১৫.৯৭ লক্ষ টাকা এবং তফসিলী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৯০.৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই টাকা পশ্চিমবঙ্গের তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ আধিকর্তার হাতে থাকবে।

## নদীয়া জেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ উদ্‌যাপন

নদীয়া জেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ পালনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। নদীয়া জিলা পরিষদের সভাধিপতির নেতৃত্বে গঠিত উদযাপন কমিটি এ উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে এই বছরটি উদযাপন করা হবে। প্রতিবন্ধীরা এ সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

## গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন

গত ১৩ এপ্রিল ১৯৮১ ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র শিলাবতী'র উদ্বোধন করেন কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পমন্ত্রী

( শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় )

# শ্রমিক-কর্মচারী সংবাদ

## খাদ্য সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির রাজ্য সম্মেলন

১৭-১৯ এপ্রিল '৮১ হাওড়া জেলার গোলমোহর-এ অবস্থিত ইস্টার্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ২৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের স্বার্থে ও খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের চাকরিতে সমস্যা সমাধান, নিরাপত্তা, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত ও বন্টনের কাজ অবিলম্বে খাদ্য কর্পোরেশনের কাছ থেকে হস্তান্তর করার লক্ষ্যে আন্দোলন ও সংগ্রামকে পরিচালিত করার আহ্বান জানিয়ে এই সম্মেলন-এর সফল পরিসমাপ্তি হয়।

এই সম্মেলনের প্রথমদিন পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় থেকে মিছিল সহকারে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হন।

২৮তম রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সরোজ চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী তাঁর ভাষণে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীর স্বৈরতন্ত্রী কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে বলেন, সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদেরও একাত্ম হয়ে দেশে সাবিক গণতান্ত্রিক ও সুস্থিত অবস্থাকে বজায় রাখবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনস্বার্থবাহী কাজগুলির সার্থক রূপায়ণে কায়েমী স্বার্থ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অপর দিকে কায়েমী স্বার্থের রক্ষক কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠী নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসা, অপপ্রচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সরকারের পতন ঘটাবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে আহ্বান জানান।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিভাগীয় কর্মচারীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মচারীদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয় মুখার্জী তাঁর ভাষণে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির অতীত সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করেন এবং শাসক শ্রেণীর ও বিভেদকারীদের যে কোন চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য সংগঠনকে উপযুক্তভাবে তৈরি করার আহ্বান জানান।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর সেনগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন প্রতিনিধিদের সম্মুখে পেশ করেন। সম্পাদকের প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় সমস্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে কর্মচারীদের আরো বেশি করে সংগঠনের পতাকাতলে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জেলা ও অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ জেলা ও অঞ্চলের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।

এইদিন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার "গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনায় এক বিশ্লেষণাত্মক মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

হাওড়া জেলার সভাপতি শ্রী শিবপদ সেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পঞ্চায়েত কর্মী ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনে বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সাংগঠনিক অবস্থা ও আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সারাভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ।

সংগ্রাম ও সংগঠনের প্রবীণ নেতা নরেন গুপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

## গ্রামীণ সংবাদ

( পূর্ব পৃষ্ঠার পর )

শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার। মোট ২৬,৬৮০ টাকা মূলধন নিয়ে এই বিপণন কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়। মূলধন বাবদ ঋণ দিয়েছেন ইউ, বি, আই ও জেলা শিল্প কেন্দ্র মেদিনীপুর।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে শ্রীমজুমদার বলেন যে, কেন্দ্রে বর্তমানে কুটির শিল্প সম্পর্কে যে নীতি চালু আছে প্রকৃতপক্ষে তাতে কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটানো যায় না।' প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একই শিল্প সামগ্রী প্রস্তুতকারক বৃহৎশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প পাশাপাশি চলতে পারেনা। সেখানে ক্ষুদ্রশিল্প মার খাবেই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন পূর্বাঞ্চলে ২৫টি সাইকেল টায়ার প্রস্তুত কারক ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩টি বন্ধ হয়ে গেছে।

গ্রামীন বিপণন কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন যে এই প্রতিষ্ঠান খোলার উদ্দেশ্য একদিকে কুটির শিল্পের বাজার সম্প্রসারিত করা ও অন্যদিকে জনসাধারণকে অপেক্ষাকৃত কমদরে কুটিরশিল্প জাত সামগ্রী সরবরাহ করা।

গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য তিনি সর্বসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করেন। সভায় পৌরহিত্য করেন ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ ইসরায়েল ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মেদিনীপুর জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি শ্রীঝাড়েশ্বর সিং মহাশয়।

## সামাজিক বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের সামাজিক কর্মী প্রশিক্ষণ সংস্থার উদ্যোগে ৬ দিন ব্যাপী সামাজিক বিকাশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা শিক্ষার্থীদের সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, সংগ্রহশালা, পুষ্টি বনসৃজন, কুটির শিল্প, প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের লোধা প্রধান অনগ্রসর ও সব থেকে পিছিয়ে থাকা গ্রামকে "মুখ্য গ্রাম ও ঐ গ্রামের সীমানা ভুক্ত গ্রামগুলিকে প্রতিবেশী গ্রামরূপে চিহ্নিত করে ঝাড়গ্রামের প্রাত ব্লকের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এই কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে। এই অনগ্রসর কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "বিকাশকেন্দ্র। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে; এই সমস্ত কাজে নেতৃত্ব দেবেন মহিলারা। গাঁয়ের মহিলা সমিতি। পুরুষরা সংসার প্রতিপালনে শ্রমের বিনিময়ে অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তাদের সময় কম। অপর দিকে মহিলাদের ধৈর্য্য বেশী। কাজের প্রতিও তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা পুরুষদের চেয়ে কম নয়। তাই এই কাজে মহিলারাই অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যরক্ষা সমাজ উন্নয়ন এই তিনটি বিভাগের প্রতিটিতে ২ জন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজ উন্নয়ন সংগঠককে নিয়ে এই কর্মসূচীর এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মোট ১৬ জন মহিলা শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন।

## স্বল্প সঞ্চয়ের উপর আলোচনাচক্র

গত ১০/৪/৮১ তারিখে, কাঁথি-১নং ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম ধানগাঁয় স্বল্প সঞ্চয়ের উপর একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন কাঁথি-১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কাঁথি ডিভিশন, মহকুমা তথ্য আধিকারিক, কাঁথি-১ ও সম্পাদক, ধানগাঁ সাধারন পাঠাগার। এই সভায় জনসাধারণের উপস্থিতি আশানুরূপ হয়নি। বর্তমানে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের আওতায় ( স্মল সেভিংস, রেকারিং ও ন্যাশান্যাল সেভিংশ সারটিফিকেট মিলিয়ে ) মো ৫৩ ( তিপান্ন ) জন, সবমোট ২৬৮২ ( দুই হাজার ছয়শত বিরাশী ) টাকা জমা দিয়েছেন।

# পঞ্চায়েত পরিক্রমা

## কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনের উদ্বোধন

গত ১ মে সকালে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কালনা ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্মিত পঞ্চায়েত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ এস, এ, মনসুর হবিবুল্লাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল।

প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান সোফিয়েৎ মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুল খালেক তাঁর প্রতিবেদনে পঞ্চায়েত গৃহ নির্মাণে সকলের সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন জানান। এই পঞ্চায়েত গৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন শ্রীগোবিন্দ পাল ও মকুন্দ পাল।

গৃহ নির্মাণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ২৩ হাজার টাকা। সরকারি অনুদান ছিল ১৪ হাজার টাকা। বাকী অর্থ পঞ্চায়েত তহবিল ও স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত হয়েছে।

## গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন উদ্বোধন

গত ৬ মে মেদিনীপুর জেলার গড়বেত ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গড়বেতা গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্মিত অফিস ভবনটির উদ্বোধন করা হয়।

অফিস ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর গ্রাম প্রধান শ্রীশ্যামল কুমার মহাপাত্র বিগত তিন বৎসরে পঞ্চায়েতের কার্যাবলী বর্ণনা করেন। শ্রীসত্য প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি বর্তমানে গ্রামবাসীদের আশা-আকাংখার প্রতীক হয়ে উঠেছে। সুষ্ঠু ভাবে কাজ করার জন্য তাই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব অফিস বাড়ী থাকা দরকার। অনুষ্ঠানের সভাপতি মহকুমা শাসক তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। গ্রামস্তর পর্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে প্রশাসনের কাজ চালাতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এবং এটা মানতেই হয় যে, পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের মধ্যে যথার্থ গণউদ্যোগ গড়ে তুলেছে। তিনি আশা করেন, পঞ্চায়েতের নিজস্ব গৃহ সদস্যদের মধ্যে আস্থার সঞ্চার করবে।

## প্রতিবন্ধীদের শিল্প-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় বিশ্বপ্রতিবন্ধী উপলক্ষের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষালাভের জন্য গত ২১-৪-৮১ তারিখে রসিদপুর মৌজায় একটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক ভাবে ১০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হয়েছে এবং একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টিতে বাঁশের পাখা, ডালা, খইচালনা, ডালি, কুলো, প্লাস্টিকের সুতোর ফুলদানি, সাইকেলের বাস্কেট তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া হবে। কিছুদিন আগে এই এলাকায় ৪৫ জন প্রতিবন্ধীকে আই-আর-ডি পরিকল্পনায় ছাগল পালনের জন্য ২৫০ টাকা হিসাবে ঋণ দেওয়া হয়। গাভী পালনের জন্য ১ জনকে ৮০০ টাকা দেওয়া হয়।

## বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্প উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৫ এপ্রিল ছোটজাগুলিয়া পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষাপ্রকল্প উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ছিল বিতর্কের বিষয়। এছাড়া, সংগীত, আবৃত্তির আয়োজনও করা হয়। সবশেষে নন্দনম নাট্যসংস্থা কিংশুক দত্তের 'মৃত্যুহীন' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বর্তমান গ্রাম্য রাজনীতির এক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় এই নাটকে। জোতদার ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মানুষের যোগসাজসে কৃষকেরা জমির অধিকার ও সংগঠনকে ধ্বংস করার প্রয়াসে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর এক চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে দিনমজুর কৃষকসম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত নাটকটি রচিত। নাটকে জোতদার চরিত্রে 'প্রণব মুখার্জি, বিশে চরিত্রে কিরীটি দত্ত, মুকিম মিঞার ভূমিকায় গোপাল মুখার্জি, রহমৎ চরিত্রে পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং অলক গুহ ও মৃত্যুঞ্জয় সেন চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন।

## পাবাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

২ মে '৮১ তারিখে নদিয়া জেলা পরিষদের অধীন কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন শিব-নিবাস গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত পাবাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহটির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী। উক্ত সভাতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধান-সভার সদস্য জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশুতোষ ঘোষ। এই উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাংগণে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়।

## পশ্চিমদিনাজপুরে ধোকড়া শিল্প প্রদর্শনী ও সেমিনার

২১ এপ্রিল কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় আই. আর. ডি. পি পরিচালনায় পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার এবং হ্যাণ্ডলুম বিভাগের বিভিন্ন অধিকর্তা, মার্কেটিং ফেডারেশনের রাজ্য স্তরের বিভিন্ন আধিকারিক, সারা ভারত হস্ত-শিল্প অধিকর্তাগণ, রাজ্য সমবায় সংস্থার প্রতি-নিধি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ সেরগ্রাম ধোকড়া প্রদর্শনী ও মুস্তকানগর ধোকড়া বয়নকেন্দ্র পরি-দর্শন করেন।

পরের দিন স্থানীয় জুট টেকনিক্যাল স্কুলে জেলা শিল্পকেন্দ্রের পরিচালনায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ধোকড়া সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বিশ্বভারতীর রীডার শ্রীপ্রবীর দাশগুপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ধোকড়ায় বর্তমানে যে সমস্ত রং ব্যবহার করা হয় তা বেশী দিন উজ্জ্বল থাকেনা। আগে যে ভাবে বনজ গাছের ফল ও ছাল থেকে রং তৈরী করে ব্যবহার করা হত বর্তমানে তা ব্যবহার করা উচিত এবং এই রং ধোকড়ার প্রকৃত রূপ পাবে। শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার।

জেলা সমাহর্তা বলেন, গাছের ফল বা ছাল থেকে যে রং ব্যবহৃত হয় তা উৎকৃষ্ট ধরনের রং। বর্তমানে **N. R. E. P.** স্কীমের শিল্পী এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যে এলাকায় এলাকায় গাছের চাষ করা দরকার। কালিয়াগঞ্জ পঞ্চা-য়েত সমিতির সভাপতি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, ধোকড়া প্রাচীনতম কুটির শিল্পে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই শিল্প কোন রকমে বেঁচে আছে, তবু পশ্চিমদিনাজপুর একমাত্র জেলা যেখানে আনুমানিক দশ সহস্রাধিক শিল্পী এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। বিশেষ করে এ সমস্ত এলাকার তপশিলী সম্প্রদায়ের গৃহবধূগণ এই শিল্পে নিযুক্ত।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির

( শেষাংশ ১১১৬ পৃষ্ঠায় )

# বিবিধ সংবাদ

### কালনায় বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে অনুষ্ঠান

গত ২৫ এপ্রিল, কালনা বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের অধীন কালনা ২নং ব্লকের উদ্যোগে সিঙ্গারকোণে বয়স্ক শিক্ষার উপর এক আকর্ষণীয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী, আদিবাসী নৃত্য, লেখা প্রতিযোগিতা এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

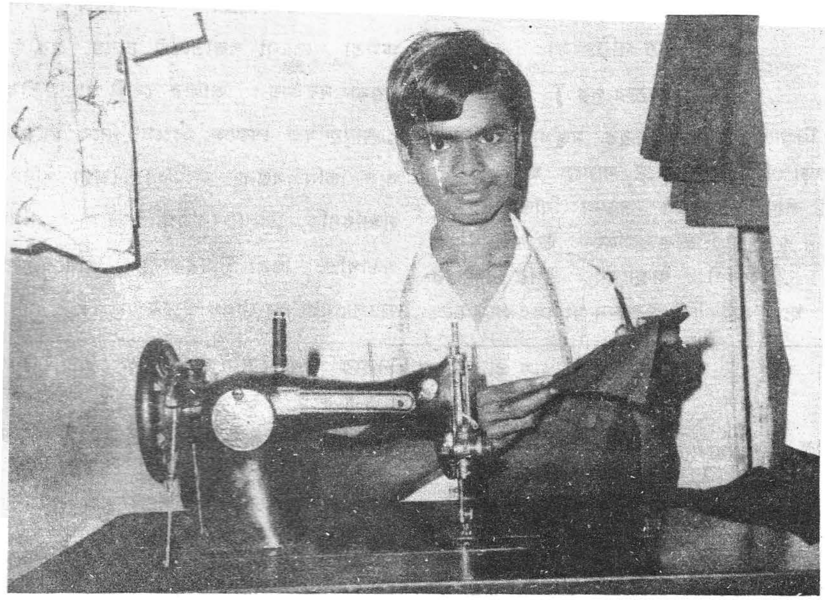
আলোচনাচক্রে মোট ৫৯ জন শিক্ষক ও ৫১ জন শিক্ষিকা যোগদান করেন। শিক্ষা প্রসারের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য এই আলোচনায় উপস্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক। অনুষ্ঠানের শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।



পুরুলিয়া জেলা হাসপাতালে প্রখ্যাত ছৌ-নৃত্যশিল্পী গুরু শ্রীগম্ভীর সিং মুড়ার চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।

### ইন্দাসে ( বাঁকুড়া ) শিক্ষা কন্‌ভেনশন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ইন্দাস শাখার আহ্বানে গত ১৮ এপ্রিল ইন্দাস প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির সমর্থনে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে ছাত্র যুব শিক্ষক শ্রমজীবী মানুষ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ ব্যাপকভাবে যোগদান করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জোনাল সভাপতি প্রশান্ত কুমার মল্লিক সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য বদন বোরা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জোনাল সম্পাদক শ্যামাপদ রায়, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সার্কেল সম্পাদক মহানন্দ দত্ত এবং রাজখামার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কানাইলাল ঘোষাল বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতিকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।



তুফানীর শিশু-নিকেতনের ছাত্র শ্রীমান সৃষ্টিধর দাসকে একটি উষা-ডিলাক্স সেলাই কল ও আনুষঙ্গিক কিছু জিনিষপত্র দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হল

### সৃষ্টিধর পায়ের নীচে মাটি পেল

সৃষ্টিধর দাস আঠার বছরের শীর্ণকায় একটি ছেলে। বীরভূমের কাষ্ঠগড়ায় বাড়ি। বাবা গরিব কৃষক। ৪ ভাইবোন। এতগুলো ছেলেকে খাওয়াবার সংগতি ছিল না। ১৯৭৬ সালে তুফানীতে পশ্চিমবংগ সরকারের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ দুঃস্থ ছেলেদের জন্য আবাস খুললে সৃষ্টিধরকে সেখানে রাখা হল। তখন তার বয়স ১৩ বছর। সৃষ্টিধর লেখাপড়া শেখার সংগে সংগে দর্জির কাজ শেখাও সুরু করে। উৎসাহ দিলেন অধ্যক্ষ শ্রী জগাইলাল সিনহা।

বর্তমান সরকার এইসব দুঃস্থ ছেলেদের অবস্থার উন্নতির জন্য আরও ব্যবস্থা নিলেন যাতে এরা নিজেদের সমাজের থেকে পৃথক না করে দেখে। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এখানে থাকা যায়। কিন্তু তার পর আবার অনিশ্চিত ছিল এদের জীবন। বর্তমান সরকার বিষয়টি ভাবলেন। সৃষ্টিধর ভেসে গেল না। তাকে একটি সেলাইয়ের মেশিন দেওয়া হল।

সৃষ্টিধরের মুখে নিষ্পাপ হাসি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে। সে নিশ্চয়ই বাঁচবে। সংগে সংগে ঐ আবাসের বাকি ১৮০টি ছোট ছোট মুখেও বাঁচার আশা দেখা গেল।

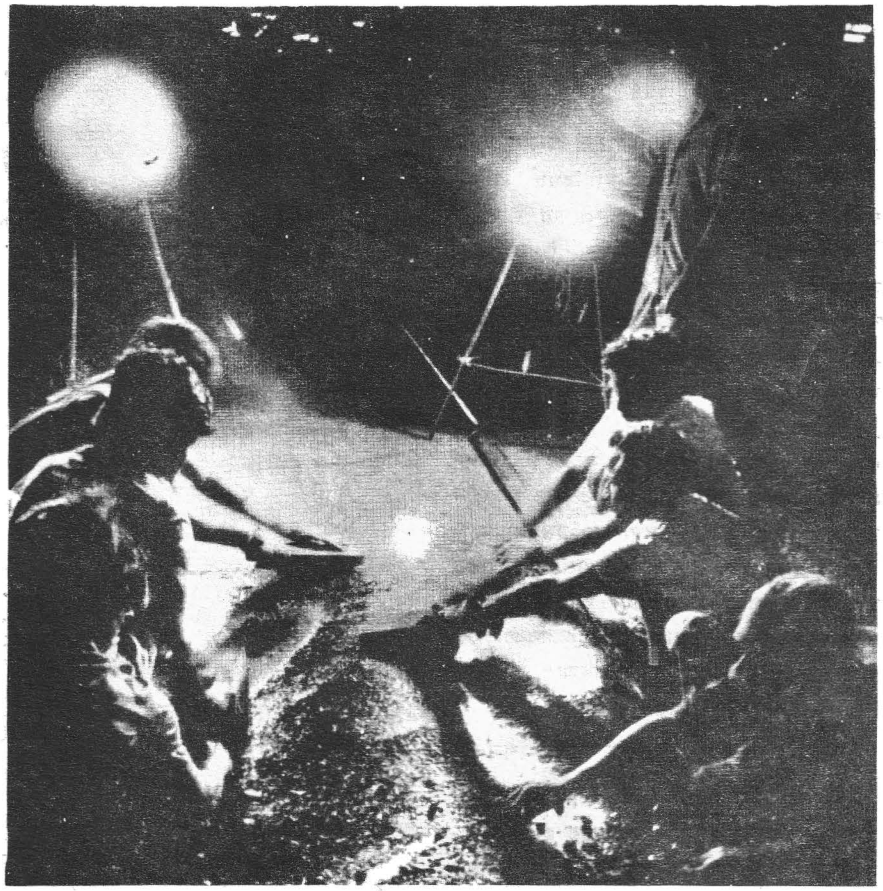
—নিজস্ব প্রতিবেদক

## যুবকের সাহসিকতা

গত ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল '৮১ ন্যাশনাল রাবার মজদুর ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ বামফ্রন্ট সরকারের তিন বছর পূর্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনী এলাকার মানুষ ও কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। গত ২৬ এপ্রিল রাত ১০টা নাগাদ প্রদর্শনী মণ্ডপটি বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। পাহারারত যুবক শ্রীরমেশ শ্রীমানী উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে এলাকার বস্তিবাসী ও প্রদর্শনী মণ্ডপটি রক্ষা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি আহতও হন। তার এই সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধি এলাকার জনসাধারণের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে রইল।

## ক্রেতা সমবায় বিপণির উদ্বোধন

গত ১ মে ৮১ তারিখে কালনা বাস স্ট্যাণ্ডে নবনির্মিত সুপার মারকেটে বর্ধমান হোল সেল্ কন্‌জিউমারস কো-অপারেটিভ সোসাইটি তাঁদের শাখা "ক্রেতা সমবায় বিপণি" উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ক্রেতা সমবায় বিপণির ৩টি শাখার (মুদিখানা মনোহারী এবং বস্ত্র) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সমবায় বিভাগের মন্ত্রী শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমবায় প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা কঠিন সমস্যার ব্যাপার। বর্তমানে আমাদের দেশে শতকরা ১জন লোক সমবায়ের সুবিধা ভোগ করেন। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে সমবায়। না লাভ না ক্ষতি ভিত্তিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি চলছে। জনসাধারণের মধ্যে সমবায় মানসিকতা জাগাতে হবে। সমবায় সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের চিন্তাধারা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য তিনি জনগণের সাহায্য চান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ, বর্ধমান হোল সেল্ কনজিউমারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি শ্রীমতী সান্ত্বনা সেন প্রমুখ সমবায় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।



ওরা কাজ করে : কলকাতার পথেঘাটে দিনের বেলায় সবক্ষণ কর্মব্যস্ততা। তাই নির্জন রাতের রাস্তায় চলে পরিশ্রমী শ্রমিকদের অক্লান্ত মেরামতির কাজ। আলোকচিত্র—দিলীপ বিশ্বাস

## পঞ্চায়েত পরিক্রমা

(১১১৪ পৃষ্ঠার পর)

শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার বলেন, ধোকড়া শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাজার সৃষ্টি করা দরকার। এজন্য বিভিন্ন গ্রামীণ বিপণি ও জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল হলে এই শিল্প একদিন ধ্বংসের পথে চলে যাবে। কোন কুটীর শিল্পের অনুদানের উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পকে দাঁড় করানোর জন্য অনুদান দেওয়া যেতে পারে। ধোকড়া শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা পুরোনো পদ্ধতিতেই চলছে, এর উন্নতি হওয়া দরকার। আবার বেশী আধুনিকীকরণ বংশানুক্রমিক শিল্পকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, শিল্পী সরকারী অফিসারগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

## যুবমানসে নজরুলের প্রভাব

(১০৯৮ পৃষ্ঠার পর)

মধ্যবিত্ত সমাজই নয়, আড়িয়াদহ থেকে শুরু করে নৈহাটি পর্যন্ত গঙ্গার ধারে প্রায় প্রতিটি চটকলে তিনি শ্রমিকদের সাথে মিশেছেন, তাদের আন্দোলন-সংগঠন-ধর্মঘটে পাশে থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন গান গেয়ে আবৃত্তি করে, বক্তৃতা করে।

তাই নজরুল শুধু বিদ্রোহী নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলার সংস্কৃতির জগতে যৌবনের প্রতীক। 'ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর/ওই নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশখীর ঝড়, এই বলে রুশ বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে এদেশে স্বাধীনতার জন্য, শ্রমিক-কৃষকের রাজ কায়েম করার জন্য যে লড়াই তিনি শুরু করে গেছেন তা আজও অসম্পূর্ণ, যদিও অব্যাহত। আজও সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে এদেশের যুব সমাজ নজরুলকে প্রেরণার অফুরন্ত সম্পদ হিসেবে গণ্য করে। আগামী দিনেও তিনি পথের দিশারী হয়ে আলো দেখাবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই তারা পথ চলেছে। শেলী বলেছিলেন, 'Poets are the trumpets that sing to battle/Poets are the unacknowledged legislators of the world' (কবিকণ্ঠেই শোনা যায় সংগ্রামের তূর্যনাদ / এ দুনিয়ার স্বীকৃতিহীন বিধায়ক ত' তারাই)—মনে হয় শেলীর এই বিখ্যাত উক্তি আমাদের দেশে নজরুলের মধ্যেই সার্থক বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে।

# পশ্চিমবঙ্গ সরকার
# ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর
# ভূমিসংস্কার শাখা
## নোটিশ

১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভেনিউ আইনটি ১৩৮৮ সালের ১ বৈশাখ (ইং ১৪ এপ্রিল, ১৯৮১) থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কাযকর হয়েছে। যে সব রায়তের ৪ একর বা তার বেশী জমি আছে, তাঁদের ১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রুলস্-এ প্রদত্ত ২নং ফর্ম অনুযায়ী জমির বিবরণ সহ একটি রিটার্ন নিজ নিজ এলাকার অ্যাসেসিং অথরিটির কাছে ১৩৮৮ সালের ২৯ জৈষ্ঠ (ইং ১২ জুন ১৯৮১)-এর মধ্যে দাখিল করতে হবে। ঐ রুলস্ ১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রিটার্ন এবং প্রয়োজনানুসারে রিটার্ন দাখিলের সংবাদ নিম্নবর্ণিত ফর্ম অনুযায়ী হাতে লিখে বা টাইপ করে দাখিল করা যাবে।

২। ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৫১ ধারায় নিযুক্ত রেভেনিউ অফিসার গণের মধ্যে যাঁরা পদমর্যাদায় এস.আর.ও.-টু এর নিচে নন তাঁদের সকলকে নিজ নিজ এলাকায় অ্যাসেসিং অথরিটি হিসেবে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকার নিযুক্ত করেছেন।

৩। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য ১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভেনিউ রুলস্ এর ৯নং রুলটি এবং ২ ও ৩ নং ফর্ম নিচে দেওয়া হল।

১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভেনিউ রুলস্

রুল নং ৯-১০নং ধারানুযায়ী রিটার্নের ফর্ম এবং তা দাখিল করার পদ্ধতি (১) ১০ (১) বা ১০ (২) ধারানুসারে রায়তকে ৯ (১) ধারায় নিযুক্ত অ্যাসেসিং অথরিটির কাছে ২নং ফর্মে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

(২) যদি কোন রায়তের দুই বা ততোধিক অ্যাসেসিং অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় জমি থেকে থাকে তাহলে তিনি যে অ্যাসেসিং অথরিটির এলাকায় বেশীর ভাগ জমি আছে তাঁর কাছে ২নং ফর্মে রিটার্ন দাখিল করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩নং ফর্ম অনুযায়ী অন্যান্য অ্যাসেসিং অথরিটিকে এই রিটার্ন দাখিলের সংবাদ জানিয়ে দেবেন।

---

আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে অ্যাসেসিং অথরিটি ............এর অধীনস্থ এলাকায় আমার মালিকাধীন যে জমি রহিয়াছে তাহার বিবরণ এই রিটার্নে দাখিল করিয়াছি এবং উক্ত আধিকারিকের নিকট আমি এই রিটার্ন দাখিলের সংবাদ পাঠাইয়াছি।

(রিটার্ন প্রদানকারী/রায়তের স্বাক্ষর)

অ্যাসেসিং অথরিটি কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট।

তারিখ :—...... ..................

অ্যাসেসিং অথরিটির স্বাক্ষর

---

রায়তকে যে রসিদ দিতে হইবে

ক্রমিক সংখ্যা—

শ্রী ........................................

ঠিকানা........................................

পরিবারের কর্তার নাম—শ্রী.....................

ঠিকানা................................ ..............—.........

এর নিকট হইতে রিটার্ন পাইলাম।

রিটার্নে ঘোষিত মোট জমির পরিমাণ :—

(রিটার্নের ২৬ নং দ্রষ্টব্য)

(যে আধিকারিক রিটার্ন পাইলেন তাঁহার সীল সহ স্বাক্ষর এবং তারিখ)

| বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে জমি ব্যবহার করা হইতেছে | ল্যাণ্ড হোল্ডিং এর মোট জমির পরিমাণ | মন্তব্য |
|---|---|---|
| (২৫) | (২৬) | (২৭) |

(১) আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের রিটার্নে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার পূর্ণ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে নির্ভুল, সম্পূর্ণ এবং সত্য।

(২) আমি ইহাও ঘোষণা করিতেছি যে,...... ............নং রসিদ মূলে........... ..... তারিখে আমি পূর্বে যে রিটার্ন দাখিল করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্তে অত্র রিটার্ন দাখিল করিতেছি।

---

রেজিস্টারের ক্রমিক সংখ্যা

( অ্যাসেসিং অথরিটি পূরণ করিবেন )

অ্যাসেসিং অথরিটি,

ঠিকানা— ...........

..............সমীপে

বিগত সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী জমির শ্রেণী বিন্যাস

| কৃষি জমি | ফলের বাগান | বাগিচা Plantation | মৎস্য চাষের জন্য পুকুর ইত্যাদি | অন্যান্য জলাশয়াদি | ফ্যাক্টারী/মিল প্রভৃতি | অকৃষি জমি | অন্যান্য ( জমির শ্রেণী, যেমন বাজার, ঘাট ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১৭) | (১৮) | (১৯) | (২০) | (২১) | (২২) | (২৩) | (২৪) |

( ১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভেনিউ নিয়মাবলীর ৯ ও ১০ নিয়ম দ্রষ্টব্য ) ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভেনিউ আইনের ১০ (১) ও (২) ধারানুযায়ী প্রদেয় রিটার্ন।

শ্রী/শ্রীমতী... ....................( রায়তের নাম )

পিতার নাম/স্বামীর নাম

পুরা ঠিকানা ..................................................................

| রায়তের নাম ( পরিবারের কর্তা অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ) | ঠিকানা যে ঠিকানায় সংবাদাদি পাঠাইতে হইবে | পরিবারের সদস্য বৃন্দের বিবরণ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের নাম | পরিবারের কর্তার সহিত সম্পর্ক | বয়স | বিবাহিত অবিবাহিত ( ১ নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য ) | ঠিকানা |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) |

| পরিবারের কর্তা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য যে রায়তগণের পক্ষে রিটার্ন দাখিল করা হইতেছে তাঁহাদের নাম | মালিকানাধীন জমির বিবরণ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জেলা | থানা | ভূমি সংস্কার সার্কেল | মৌজার নাম ও জে. এল. নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | দাগের জমির মোট পরিমাণ | দাগভুক্ত জমিতে মোট অংশের পরিমাণ |
| (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) | (১৪) | (১৫) | (১৬) |

মন্তব্যাদি ঃ—(১) "বিবাহিত/অবিবাহিত" স্তম্ভের নীচে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৪কে (সি) ধারানুযায়ী বিবাহিত, অবিবাহিত বা বিধবা ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) কোন পরিবারে একাধিক রায়ত থাকিলে প্রত্যেক রায়তের নামের পাশে প্রত্যেক প্রকার জমির বিবরণসহ একটি পূর্ণ বিশদ রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে। এই রিটার্ন পরিবারের কর্তা অথবা অন্যান্য সদস্যদের অনুমতিক্রমে পরিবারস্থ যে-কোন রায়ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(৩) ১০ (২) ধারানুযায়ী যে জমি/জমিগুলির জন্য রিটান দাখিলের প্রয়োজন, সেই জমি/জমিগুলির মালিকানা কোন সময়ে বা তারিখে পাইয়াছেন, তাহা "মন্তব্যের" ঘরে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) * যাহা প্রযোজ্য নহে, তাহা কাটিয়া দিতে হইবে।

ফর্ম ৩

(১৯৮০ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড রেভিনিউ নিয়মাবলীর ৯ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

এক জনের বেশী অ্যাসেসিং অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় রায়তের জমি থাকিলে রিটার্ন দাখিল করা সম্পর্কে রায়ত কর্তৃক অবহিত করণ।

শ্রীমতী.................................................................(রায়তের পুরা নাম)

পিতার/স্বামীর নাম.......................................................

পুরা ঠিকানা...............................................................

অ্যাসেসিং অথরিটি.................................................

ঠিকানা.......................................................

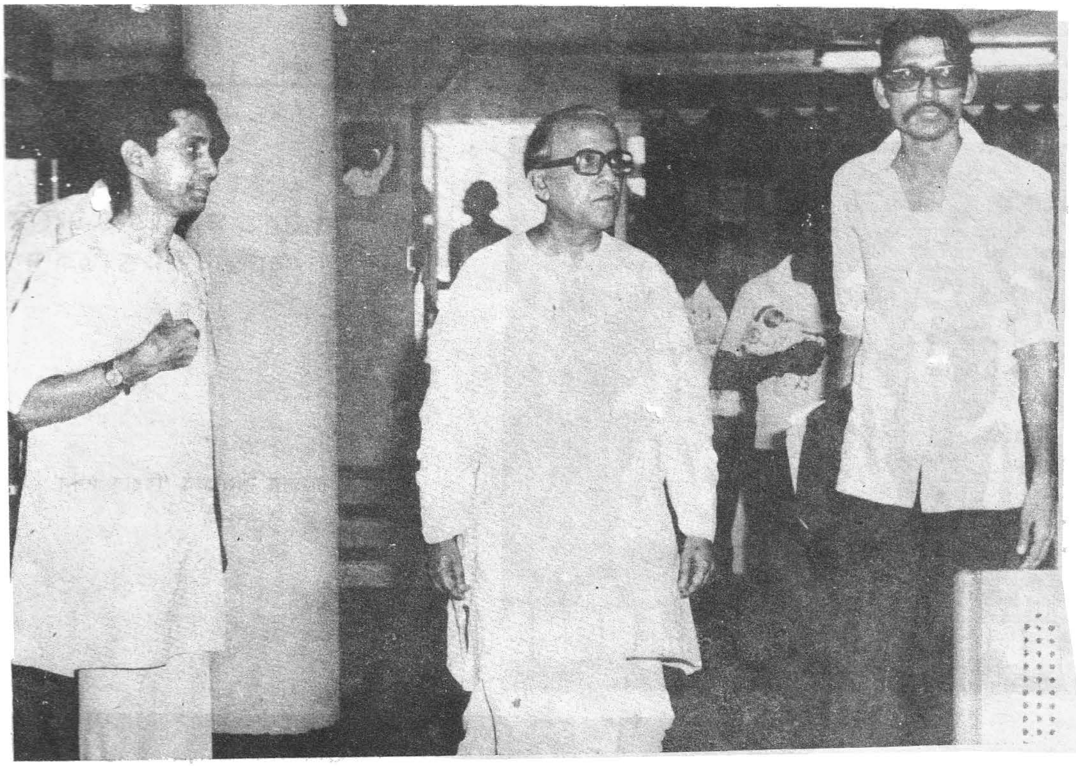
সমীপে

আমি, শ্রীমতী........................................................এতদ্বারা আপনাকে জানাচ্ছি যে ১৯৭৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ল্যাণ্ড হোল্ডিং রেভিনিউ আইনের ১০ নং ধারার (৪) অথবা (৫) উপধারা মতে আমার জমির রিটার্ন আমি অ্যাসেসিং অথরিটি, ......................এর নিকট (যাহার নিকট রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে তাহার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি দাখিল করিয়াছি। আপনার কতৃত্বাধীন এলাকায় আমার যে জমি আছে তাহাও ঐ-রিটার্ন-উল্লেখ করা হইয়াছে। ২ নং ফর্মে দাখিলীকৃত রিটার্নের একটি নকল অত্র সহ দেওয়া হইল।

রায়তের স্বাক্ষর অথবা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ

দ্রষ্টব্য ঃ—(১) যে সব অ্যাসেসিং অথরিটির অধীনস্থ এলাকায় রায়তের জমি আছে তাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরূপ রিটার্ন দাখিলের সংবাদ জানাইতে হইবে।

(২) ২ নং ফর্মে দাখিলীকৃত রিটার্নের একটি নকল অত্র সহ দিতে হইবে।



মাদ্রাজে ৮ মে ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নব-প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন
করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু



পূর্বভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনে মণিপুরের সাংস্কৃতিক দল

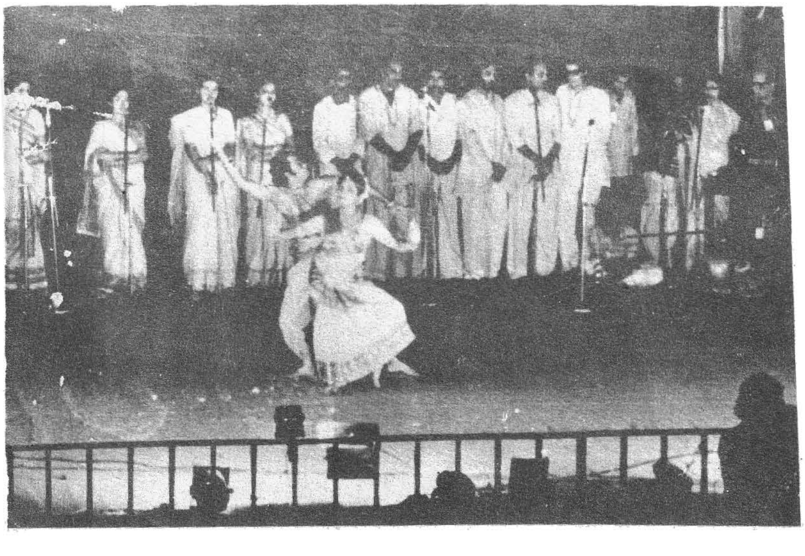
## পূর্বভারত সংস্কৃতি ও সংহতি সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান



বিহার রাজ্যের শিল্পীদের 'বিহার দর্শন' নৃত্য



মণিপুর রাজ্যের শিল্পীদের নাগা নৃত্য



'জাগো মোহন প্রীতম'—প্রগ্রেসিভ কালচারাল সেন্টারের যুগল নৃত্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও হুগলী প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৭১ থেকে মুদ্রিত।